বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

জ্ঞানের বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। বিশেষত, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পক্ষে বাধার অন্ত নাই, ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার আশ্রয় লন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন।

১ বৈশাখ ১৩৫০ হইতে প্রতিমাসে অন্যূন একখানি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে ছয় আনা ও আট আনা।

। প্রকাশিত হইয়াছে ।

মায়াবাদ

শ্রীপ্র[illegible]



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

১ আশ্বিন ১৩৫০

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

আমার পরমারাধ্য দেবতা

স্বর্গীয় পিতৃদেব

৺তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রীচরণোদ্দেশে

ভক্তিভরে এই গ্রন্থ অর্পিত হইল।

তাই বলিতেছি যে, কার্য ও কারণের তত্ত্ব লইয়াই দর্শনশাস্ত্র। এই ভাবে দেখিতে গেলে ইহাও মানিতে হয় যে, দর্শনশাস্ত্রই মানবের সকল বিদ্যার মূলভিত্তি। ধর্মনীতি, রাজনীতি, গণিতবিদ্যা, বিজ্ঞানশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র; বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ এবং আবেস্তা প্রভৃতি—যত কিছু মনুষ্যজাতির জ্ঞানগৌরবের সমুজ্জ্বল নিদর্শন—সে সকলই ত, এই কার্যকারণভাবনারূপ এক অকম্প্যভিত্তির উপর ব্যবস্থাপিত। কার্য ও কারণের ভাবনাই ত দর্শন, সুতরাং দর্শনশাস্ত্রই যে আমাদের সকল শাস্ত্রের অপরিহার্য অবলম্বন—তাহা কে না স্বীকার করিবে?

এই কার্য ও কারণের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে এ পর্যন্ত জগতের দার্শনিকগণ তিন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; সেই সিদ্ধান্ত তিনটির নাম যথাক্রমে—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। এই তিনটি সিদ্ধান্তের মধ্যে যেটি শেষ, অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদ, সেই বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ একই বস্তু। এই বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ বুঝিতে হইলে, অগ্রে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে; সেই জন্য আমি যথাক্রমে আরম্ভ-বাদ ও পরিণামবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অগ্রে দিব।

আরম্ভবাদ

কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ, কারণগুলি সব যখন মিলিত হয়, তাহার পরক্ষণেই কার্য উৎপন্ন হয়, কার্য হইতে কারণ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন—এইপ্রকার সিদ্ধান্তই আরম্ভবাদ।

একটা দৃষ্টান্ত দেখিলেই এই মতটি বেশ বুঝা যাইবে, যেমন, কোন একজন যদি বস্ত্ররূপ একটি কার্য করিতে চাহে, তবে তাহার প্রথম কর্তব্য কি? তুলা, সুতা, ও তাঁতরূপ কারণগুলির সংগ্রহ করাই তাহার অগ্রে কর্তব্য। এই কয়টি কারণের মধ্যে সূত্ররূপ যে কারণ, আরম্ভবাদিগণ তাহাকে বস্ত্রের উপাদান বা সমবায়ী কারণ কহেন। যাহাকে অবলম্বন করিয়া কার্য উৎপন্ন হয়—আবার উৎপন্ন হইয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়াই ঐ কার্য বর্তমান থাকে, এবং বিনাশকালে যে বস্তুতে ঐ কার্যের বিলয় হয়, সেই কারণকে কার্যের উপাদান বা সমবায়ী কারণ বলা যায়। বস্ত্র সূত্র হইতেই উৎপত্তি লাভ করে, আবার যতক্ষণ বর্তমান থাকে ততক্ষণ সূত্রসমূহকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং বিনাশকালে (এক-একগাছি করিয়া সূত্রগুলিকে পৃথক্ করিয়া ফেলিলে) ঐ সূত্রেতেই বিলীন হয়, এইজন্য সূত্রকে বস্ত্রের উপাদান বা সমবায়ী কারণ বলা যায়।

এই উপাদান বা সমবায়ী কারণ ছাড়া, বস্ত্রের আর একজাতীয় কারণ আছে, তাহার নাম নিমিত্ত-কারণ। কার্য উৎপন্ন হইবার ঠিক পূর্বক্ষণে যে-সকল কারণের অপেক্ষা করিতে হয়, অথচ কার্য উৎপন্ন হইয়া গেলে কার্যের স্থিতির জন্য, যে সকল কারণের অপেক্ষা করিতে হয় না, সেই সকল কারণকে কার্যের নিমিত্ত-কারণ বলা যায়। তন্তুবায়, তুরী, তাঁত প্রভৃতি কারণগুলি বস্ত্রের নিমিত্ত-কারণ। বস্ত্রের উৎপত্তির ঠিক পূর্বক্ষণে তন্তুবায় প্রভৃতির অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু বস্ত্র উৎপন্ন হওয়ার পর তাহার

অবস্থিতির জন্য, তন্তুবায় প্রভৃতির অপেক্ষা করিতে হয় না। তন্তুবায় মরিলে বা তন্তুবায়ের তাঁত ছিঁড়িয়া গেলেই যে ঐ বস্ত্রখানি বিনষ্ট হইবে—তাহা কেহই স্বীকার করে না। এইজন্য তন্তুবায় প্রভৃতি, বস্ত্রের নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ নহে।

আরম্ভবাদীরা এই দ্বিবিধ কারণ ভিন্ন আর একজাতীয় কারণও স্বীকার করিয়া থাকেন। সে কারণের নাম অসমবায়ী কারণ। অসমবায়ী কারণ কাহাকে বলে? যে কারণ সমবায়ী কারণের উপর আশ্রিত, যাহার নাশ হইলে কার্য্যদ্রব্যের নাশ অবশ্যম্ভাবী—সেই কারণের নাম অসমবায়ী কারণ।

সমবায়ী কারণ অনেক হওয়া চাই। সেই অনেকগুলি সমবায়ী কারণ পরস্পর মিলিত না হইলে কার্য উৎপন্ন হয় না, সুতরাং কার্যের জন্মিবার পূর্বে যেমন সমবায়ী কারণগুলি থাকাই চাই সেইরূপ সমবায়ী কারণগুলির মিলনও হওয়া চাই। ঐ মিলন না হইলেও কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না, এইজন্য ঐ মিলন বা সমবায়ী কারণসমূহের পরস্পর-সংযোগও যে কার্যের কারণ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ মিলন বা সমবায়ী কারণের পরস্পরসংযোগকে নিমিত্ত কারণ বলা যায় না, যেহেতু, নিমিত্ত-কারণের একপ স্বভাব নহে যে, উহার নাশ হইলে কার্যদ্রব্য নষ্ট হইবেই; কিন্তু—আমরা যাহাকে অসমবায়িকারণ বলিতেছি, তাহার স্বভাব এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার নাশ হইলে কার্যদ্রব্যের নাশ অবশ্যই হইবে। বস্ত্রের উপাদান কারণ সূত্র। সূত্রগুলির পরস্পর নিবিড়সংযোগ যাহা তন্তুবায় তাঁতের সাহায্যে করে, সেই নিবিড়সংযোগ যদি নষ্ট হয় তাহা হইলে বস্ত্রও নষ্ট হয়, এইজন্য সূত্রগুলির সেই নিবিড়সংযোগই বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ। এক্ষণে এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে, সূত্রের নাশ হইলেও বস্ত্রের নাশ হইয়া থাকে এইজন্য সূত্র বস্ত্রের উপাদান-কারণ। সুতরাং উপাদান-কারণের নাশই কার্যনাশের হেতু; এই প্রকার বলিলেই চলে। তাহাই যদি হইল, তবে অসমবায়ী কারণের নাশ হয় বলিয়া কার্যের নাশ হয়, এবং যাহার

নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ হয়, তাহা সমবায়ী কারণ ছাড়া আর একটা পৃথক্ কারণ, এবং তাহার নামই অসমবায়ী কারণ, এই বলিয়া একটা তৃতীয় কারণ কেন স্বীকার করা হইতেছে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কার্যদ্রব্যের উপাদান-কারণ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে, উপাদান-কারণের নাশ—কার্যদ্রব্যনাশের কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু সকল কার্যদ্রব্যের উপাদান-কারণ যে অনিত্যই হইবে, তাহা ত বলিতে পারা যায় না। কারণ দুইটি নিত্যপরমাণু মিলিত হইয়া একটি দ্ব্যণুকনামক কার্যদ্রব্যকে উৎপন্ন করে। পরমাণু নিত্য—সুতরাং তাহার নাশ হইতে পারে না। (পরমাণু কি? কেনই বা পরমাণু স্বীকার করিতে হয়? তাহার পরিচয় আরম্ভবাদ-খণ্ডনের সময় দিব, এই কারণে এই স্থানে আর পরমাণুর বিশেষ পরিচয় দেওয়া গেল না)। তাহাই যদি হইল, তবে এক্ষণে দেখা উচিত যে, ঐ দ্ব্যণুক বিনাশের কারণ কি? পরমাণু দুইটি বিনষ্ট হইলেই ঐ দ্ব্যণুক বিনষ্ট হইবে, তাহা ত বলা যায় না; কারণ, পরমাণুকে আরম্ভবাদিগণ নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং পরমাণুর নাশ সম্ভবপর নহে। এইজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দ্ব্যণুকরূপ কার্যদ্রব্যের যে ধ্বংস হয়—তাহার কারণ অসমবায়ী কারণের ধ্বংস অর্থাৎ দ্ব্যণুকের উপাদান-কারণ যে পরমাণুদ্বয়, তাহাদের যে পরস্পর-সংযোগ তাহা দ্ব্যণুকের অসমবায়ী কারণ, সেই সংযোগের ধ্বংসই দ্ব্যণুক ধ্বংসের কারণ। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগরূপ অসমবায়ী কারণের ধ্বংসই দ্ব্যণুকধ্বংসের হেতু। যে কারণের ধ্বংস হইলে কার্যদ্রব্যের ধ্বংস হইবেই, সেই কারণকেই যে আরম্ভবাদিগণ অসমবায়ী কারণ বলিয়া থাকেন ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

কণাদ এবং গৌতম এই দুইজন মহর্ষিই আরম্ভবাদী। কণাদ-প্রণীত দর্শন শাস্ত্র বৈশেষিক দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌতম-প্রণীত দর্শনকে ন্যায়দর্শন কহা যায়।

গৌতম এবং কণাদ, এই উভয় মহর্ষির মত এই যে, কার্য ও কারণ

পরস্পর ভিন্ন। যে সূত্রগুলি পরস্পর মিলিত হইলে বস্ত্র হয় সেই সূত্রগুলিই যে বস্ত্র, তাহা নহে। সূত্রগুলি বস্ত্রের কারণ, বস্ত্রখানি সূত্রগুলির কার্য। কার্য ও কারণ যখন পরস্পর ভিন্ন, তখন সূত্রসমষ্টিই যে বস্ত্র তাহা কখনই সম্ভবপর নহে; যেহেতু কারণ ও কার্য যদি একই বস্তু হইত, তাহা হইলে, লোকে কার্য নির্মাণ করিবার জন্য প্রযত্ন করিত না। কেন না, কার্য যখন কারণ হইতে ভিন্ন নহে, আর সেই কারণও যখন পূর্বসিদ্ধই রহিয়াছে, তখন কার্যও যে পূর্বসিদ্ধ ইহা বলিতেই হইবে। কার্য যদি পূর্বসিদ্ধই হয় তবে তাহাকে উৎপন্ন করিবার জন্য আবার চেষ্টা কেন? তাহা ছাড়া আরও দ্রষ্টব্য এই যে, কারণের দ্বারা যে-সকল কার্য সিদ্ধ হয়, কার্য দ্বারা সেই সকল কার্য সিদ্ধ হয় না। কার্য ও কারণ যদি একই বস্তু হইত, তাহা হইলে কার্য ও কারণের দ্বারা একই প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইত, কিন্তু তাহা ত আর ঘটে না। সূত্রগুলির দ্বারা যে কার্য হয়, পটের দ্বারা সে কার্য হয় না। আবার পটের দ্বারা যে কার্য হয়, সূত্রগুলির দ্বারাও সে কার্য হয় না। সূত্রের দ্বারা বন্ধন হয়, কিন্তু আচ্ছাদন হয় না। বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন বা আবরণ হয়—কিন্তু ঠিক সূত্রের দ্বারা যাহার যে ভাবে বন্ধন হয়, বস্ত্রের দ্বারা তাহার সেই ভাবে বন্ধন হয় না। আরও দেখ, মাটির দ্বারা জলের আহরণ হয় না, ঘটের দ্বারা জলের আহরণ করা যায়। আবার মাটির দ্বারা লেপন হয়, কিন্তু ঘটের দ্বারা লেপন হয় না। মাটি ও ঘট যদি একই বস্তু হইত, তাহা হইলে, মাটির কার্য এবং ঘটের কার্যও যে এক হইত ইহা কে না স্বীকার করিবে? এই প্রকার বহুবিধ যুক্তি দ্বারা আরম্ভবাদিগণ কার্যকে তদীয় উপাদান হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। আরম্ভবাদিগণের মতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব—পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে-ক্রমে বড় হইতে হইতে এত বড় হইয়া বসিয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে প্রত্যক্ষদৃশ্য কোন বস্তুই ছিল না। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্বিধ পরমাণু; আকাশ, কাল, দিক্‌, মন, ঈশ্বর ও অসংখ্য জীবাত্মা—এই কয় প্রকারের নিত্যবস্তু সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান

ছিল; সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বে পার্থিব পরমাণুগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রমে স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম পৃথিবীরূপে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে অতি সূক্ষ্ম জলীয়পরমাণু হইতেও স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম জলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই প্রকারেই অগ্নি ও বায়ুর পরমাণুগণও মিলিত হইয়া স্থূল অগ্নি ও বায়ুর উৎপাদন করিতে লাগিল; এই প্রকারে সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া ঐ চতুর্বিধ পরমাণু এই মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নিময় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে নির্মিত করিয়া তুলিয়াছে।

ইঁহাদের মতে পদার্থ দুই প্রকার—প্রথম ভাব, দ্বিতীয় অভাব। ভাব-পদার্থ আবার ছয় ভাগে বিভক্ত, যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায় এবং বিশেষ। অভাবও চারিপ্রকার, যথা—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব।

প্রথমে চারিটি অভাবের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করা যাক—তাহার পরে ভাব-পদার্থ ছয়টির স্বরূপ বুঝা যাইবে।

প্রাগভাব। কোন কার্য যে পর্যন্ত উৎপন্ন না হয়, সেই পর্যন্ত তাহার যে জাতীয় অভাবকে আমরা অনুভব করি, সেই জাতীয় অভাবকে আরম্ভ-বাদিগণ প্রাগভাব বলিয়া থাকেন। এই মাটিতে ঘট উৎপন্ন হইবে—এই কথা শুনিয়া, আমরা ঘটের যে অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি, তাহাকেই ঘটের প্রাগ-ভাব বলা যায়।

ধ্বংসাভাব। ঘটের উপর একটি প্রকাণ্ড মুদ্গরের দ্বারা বলপূর্বক আঘাত করিলে ঘটের যে অভাব আসিয়া পড়ে, তাহারই নাম ঘটের ধ্বংসাভাব বা বিনাশ।

অত্যন্তাভাব। ঘটের বর্তমানতাবস্থাতেই, যেখানে ঘট থাকে সেই স্থান ভিন্ন, অন্য সকল স্থানেই, আমরা ঘটের যে জাতীয় অভাব আছে বলিয়া বুঝিয়া থাকি, সেই জাতীয় অভাবকে—ঘটের অত্যন্তাভাব কহা যায়।

অন্যোন্যাভাব। ঘট পট নহে, কিংবা পট ঘট নহে, এই প্রকার শব্দ

শুনিলে, আমরা ঘটের বা পটের যে অভাব বোধ করিয়া থাকি, সেই অভাব ঘটের বা পটের—অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাব ও ভেদ—এই দুইটি শব্দ একই প্রকার অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

এইবার ছয়টি ভাব-পদার্থের সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি।

১ম, দ্রব্য। যাহাতে গুণ থাকে অর্থাৎ যাহা গুণের আশ্রয়, তাহাকেই দ্রব্য বলা যাইতে পারে। এই দ্রব্য আরম্ভবাদীদিগের মতে নয়ভাগে বিভক্ত; যথা—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, মন এবং আত্মা।

২য়, গুণ। সর্বসমেত গুণ চব্বিশটি, যথা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পার্থক্য, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব (দূরত্ব ও জ্যেষ্ঠত্ব), অপরত্ব (নিকটত্ব ও কনিষ্ঠত্ব), জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, পাপ, পুণ্য ও শব্দ।

৩য়, কর্ম। গতি বা গমনকেই কর্ম বলে। কর্মও অনেক প্রকার—এক কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, উৎপন্ন হইবার পরেই, যাহা নিজের আশ্রয়দ্রব্যে সংযোগ ও বিভাগ নামক দুইটি গুণকে উৎপাদন করিবেই করিবে, সেই বস্তুকেই আরম্ভবাদিগণ কর্ম বা স্পন্দ বলিয়া থাকেন।

৪র্থ, সামান্য বা জাতি। জাতি নানাপ্রকার—গোত্ব, ঘটত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি। অনেক বস্তুতে অনুগত নিত্য ধর্মগুলিকে নৈয়ায়িকগণ জাতি বলিয়া থাকেন। জাতিসম্বন্ধে বক্তব্য এত বেশী যে, একখানি বৃহৎ পুস্তক লিখা হইলে তবে নৈয়ায়িকগণের জাতিতত্ত্ব কথঞ্চিৎ বুঝান সম্ভব; এখানে যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব আমি জাতির পরিচয় দিলাম—বিস্তৃতভাবে ঐ সকল কথা এই প্রসঙ্গে বলা সম্ভব নহে।

৫ম, বিশেষ। এই পদার্থটিও বড় দুরূহ। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, নিত্যদ্রব্যগুলির মধ্যে এমন এক-একটি ধর্ম আছে, যাহার বলে তাহারা সজাতীয় ও বিজাতীয় অন্য সকল বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। সেই স্বভাবসিদ্ধ বৈলক্ষণ্যকেই কণাদ-মতানুযায়ী দার্শনিকগণ বিশেষ বলিয়া

নির্দেশ করেন। বিশেষ কি বস্তু তাহা বুঝাইবার জন্য, নব্য বৈশেষিকগণ আরও একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, মাটিতে একটি আম্রবীজ বপন করিলে, ঐ বীজটি মাটির মধ্য হইতেই নিজের সজাতীয় আম্রের উপাদান-কারণগুলিকে টানিয়া লইয়া ক্রমে একটি বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, অথবা আম্রের অন্যান্য উপাদান কারণগুলি, মাটির মধ্যে যাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ছড়াইয়া থাকে, বীজ পুঁতিবার পরই তাহারা পরস্পর একত্র হইয়া সেই বীজের সহিত মিলিত হইয়া আম্রবৃক্ষ রূপে পরিণত হয়। যাহাই হউক না কেন, এক মাটিতে সকল প্রকার বৃক্ষের উপাদান কারণগুলি অন্তর্নিহিত থাকিলেও, উহারা সজাতীয় উপাদানদ্রব্যের সহিতই মিলিত হইয়া কার্যরূপে পরিণত হয়, বিজাতীয় উপাদানগুলির সহিত মিলিত হইয়া কখনও বিসদৃশ কার্যের উৎপাদক হয় না। এই যে উপাদানপরমাণুগুলির সজাতীয় পরমাণুর সহিত মিলিত হইবার, এবং বিজাতীয় পরমাণু সকলের সহিত মিলিত না হইয়া দূরে থাকিবার সামর্থ্য, সেই সামর্থ্যই বিশেষ পদার্থ। অর্থাৎ উপাদানরূপ পরমাণুসমষ্টির সদৃশপরমাণুগুলির সহিত মিশ্রণ-শক্তি, এবং বিজাতীয় পরমাণুগুলি হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকিবার সামর্থ্য বা বিজাতীয়-বিশ্লেষণশক্তি—এই দ্বিবিধ শক্তিই বৈশেষিক দার্শনিকগণের মতে বিশেষ পদার্থ।

৬ষ্ঠ সমবায়। সমবায় একপ্রকার সম্বন্ধবিশেষ। কার্যের সহিত উপাদান কারণের যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলা যাইতে পারে। সূত্রগুলি উপাদান কারণ, বস্ত্রখানি উপাদেয় কার্য। যদি বল, সূত্রগুলির সহিত বস্ত্রখানির সম্বন্ধ কি? তাহার উত্তরে আরম্ভবাদিগণ বলিবেন, সূত্রের সহিত বস্ত্রের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। এইরূপ দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্মের যে সম্বন্ধ, তাহারও নাম সমবায়। আবার জাতি বা সামান্যের সহিত তাহার আধার দ্রব্য, গুণ ও কর্মের যে সম্বন্ধ, তাহারও নাম সমবায়। যেমন পৃথিবীত্ব-জাতির সহিত পৃথিবীরূপ দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। এইরূপ নীলত্ব বা

পাকস্বরূপ দুইটি জাতির সহিত নীল গুণ ও পাক ক্রিয়া এই দুইটি আশ্রয়ের যথাক্রমে যে সম্বন্ধ, তাহাও সমবায়। তাহা ছাড়া, কণাদ-মতানুযায়ী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, নিত্য দ্রব্যগুলির সহিত তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ বিশেষেরও যে সম্বন্ধ তাহাকে ও সমবায় বলা যায়।

এই ছয়প্রকার ভাব এবং চারিপ্রকার অভাবের স্বরূপ ভাল করিয়া জানিতে পারিলেই মানুষ মুক্ত হয়। কারণ, বিপরীত জ্ঞানই আমাদের দুঃখের কারণ, যাহা যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলিয়া বুঝি বলিয়াই ত আমরা দুঃখভোগ করি। পূর্বে বলিয়াছি, আরম্ভবাদিগণের মতে আত্মা নয়প্রকার দ্রব্যের অন্যতম। তাঁহারা বলেন, আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা অসংখ্য, যত দেহ তত জীবাত্মা। পরমাত্মা কিন্তু এক। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ন—এই ছয়টি জীবাত্মার বিশেষ গুণ। এই গুণ কয়টি অনিত্য —অর্থাৎ এই গুণ কয়টি জীবাত্মাতে সকল সময়ই যে থাকে তাহা নহে, সময় বিশেষে, ইহাদের মধ্যে কোন না কোন একটি গুণ জীবে উৎপন্ন হয়, এবং অচিরেই তাহা বিনষ্ট হয়। জীবের জন্ম বা মরণ নাই। দেহের সহিত জীবের সংযোগ ও বিয়োগ, যথাক্রমে জন্ম ও মৃত্যু বলিয়া কথিত হয়। ইহা না বুঝিয়াই ভ্রান্ত জীব "আমি মরিলাম" বা "আমি মরিব" এই প্রকার ভাবিয়া বৃথা দুঃখ ভোগ করে।

পরমাত্মার তিনটিমাত্র বিশেষ গুণ আছে—জ্ঞান, ইচ্ছা এবং যত্ন। পরমাত্মার এই তিনটি বিশেষ গুণ কিন্তু নিত্য, অর্থাৎ তাঁহার সর্ববিষয়ক ইচ্ছা, সর্ববিষয়ক জ্ঞান এবং সর্বকার্যানুকূল প্রযত্ন, সর্বদাই বিদ্যমান আছে। পরমাত্মার সুখ, দুঃখ ও দ্বেষ নাই। এই সুখ, দুঃখ ও দ্বেষ জীবাত্মারই ধর্ম। দেহ প্রভৃতি অনিত্যবস্তুর সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞান বা নিজত্বজ্ঞানই জীবাত্মার (সুখ ও দুঃখ ভোগরূপ) সংসারের কারণ। এই জ্ঞানই আরম্ভবাদিগণের মতে অবিদ্যা বা বিপরীতজ্ঞান। এই জ্ঞানই আমাদের যাবতীয় দুঃখের কারণ। আমরা যদি বুঝি, আত্মা নিত্য, দেহ ও ইন্দ্রিয় আত্মা

নহে, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, তাহা হইলে আর আমরা দেহ বা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বা আত্মীয় বলিয়া অভিমান করি না। এইপ্রকার দেহাত্মাভিমান নিবৃত্ত হইলে, আমাদের দুঃখের কারণও বিলুপ্ত হয়। দুঃখের ঐকান্তিক বিনাশই ত মোক্ষ। বস্তুনিচয়ের তত্ত্বজ্ঞানই অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে ও দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষলাভের উপায় হইয়া থাকে। এই কারণে, জাগতিক বস্তুগণের যাহার যাহা স্বভাব, তাহা ভাল করিয়া জানা উচিত, সেই জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় দর্শনশাস্ত্র। দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে আরম্ভবাদ বা ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনই শ্রেষ্ঠ—সুতরাং সবদুঃখনিবৃত্তির জন্য এই আরম্ভবাদের অনুশীলন করা কর্তব্য। ইহাই হইল গোতম, কণাদ এবং তন্মতানুযায়ী-দার্শনিক বা নৈয়ায়িকগণের উপদেশ।

পরিণামবাদ বা সৎকার্যবাদ

পরিণামবাদিগণের মতে, কার্য চিরকালই আছে এবং থাকিবে—কার্য কারণের রূপান্তরমাত্র, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে। আরম্ভবাদিগণ বলেন যে, উৎপন্ন হইবার পূর্বে কার্য একেবারেই অসৎ—অর্থাৎ তাহার কোন সত্তাই থাকে না, উৎপন্ন হইয়া তবে কার্য সৎ হয়। পরিণামবাদীর মতে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য যদি অসৎ বা অভাবস্বরূপ হয়, তাহা হইলে কোনরূপেই তাহাকে সৎ করা যাইতে পারে না, যাহা অসৎ তাহা কখনই সৎ হয় না, আবার যাহা সৎ তাহা কখনই অসৎ হইতে পারে না।

মনে কর, তিল কারণ, তৈল কার্য, তিলের মধ্যে তৈল যদি অব্যক্তভাবে না থাকিত, তাহা হইলে ঘানিতে পিষিয়া তিলের মধ্য হইতে তৈল বাহির করিতে কেহ কি সমর্থ হইত? বালুকারাশি হইতে পিষিয়া কেহই তৈল বাহির করিতে পারে না, কিন্তু তিলরাশি হইতেই পিষিয়া তৈল বাহির করা যায়—ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, বালুকার মধ্যে তৈল অব্যক্তভাবে বিদ্যমান নাই, সুতরাং সহস্র চেষ্টা করিয়াও বালুকা হইতে তৈল বাহির করা যায় না, কিন্তু তিলের মধ্যে তৈল অব্যক্তভাবে আছে, এইজন্যই একটু আয়াস স্বীকার করিলেই, তিল হইতে তৈল বাহির করিতে পারা যায়।

এই স্থলে আরম্ভবাদিগণ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, বালুকার সহিত তৈলের কার্যকারণভাবরূপ সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তিলের সহিত তৈলের কার্য-কারণভাবরূপ একটা সম্বন্ধ আছে, এই কারণে বালুকা হইতে তৈল বাহির হয় না, কিন্তু তিল হইতেই তৈল বাহির হয়। কারণ হইতেই কার্য হয়, যাহা যাহার কারণ নহে, তাহা হইতে সেই কার্য হইবে কিপ্রকারে?

ইহার উত্তর এই যে, মানিয়া লইলাম, কারণের সহিত কার্যের

কার্যকারণভাবরূপ একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া, কারণ হইতেই কার্য হয়—তিলের সহিত তৈলের ঐরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সম্বন্ধ বলিলে আমরা কি বুঝি? আমরা বুঝি, দুইটি পৃথক্ বস্তুর পরস্পর মিলনই সম্বন্ধ। ঘানিযন্ত্রে তিলগুলি ফেলিয়া পিষিবার পূর্বে, আরম্ভবাদিগণের মতে, তৈল গগনকুসুমের ন্যায় অলীক; যাহা অলীক, তাহার সহিত কাহারও কোনপ্রকার সম্বন্ধ কিছুতেই সম্ভবপর নহে; তাহাই যদি হইল—তবে তৈল উৎপন্ন হইবার পূর্বে, তিলের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকাই সম্ভবপর নহে, সুতরাং তাহার সহিত তিলের কার্যকারণ ভাবরূপ সম্বন্ধও অসম্ভব। ফলে দাড়াইল যে, উৎপত্তির পূর্বে তৈল অসৎ বলিয়া তাহার সহিত কাহারও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তিলের সহিত যেমন তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, বালুকার সহিতও তাহার সেইরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে, কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া বালুকা হইতে তৈল উৎপন্ন হইতে পারে না, এই প্রকার বলাও যুক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। দুইটি পদার্থ যদি সৎ হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন না কোন একটা সম্বন্ধও সম্ভবপর হয়। অসতের বা অলীকের সহিত, সতের বা সত্যের কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না—এই নিয়মানুসারে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তিলের সহিত তৈলের কোনপ্রকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া যদি তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই, তৈল উৎপন্ন হইবার পূর্বেও তিলের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল এবং সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইহাও মানিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্বে তৈল বিদ্যমান ছিল, কারণ, যাহা বিদ্যমানই নহে—তাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ হইবে কিপ্রকারে? সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও আরম্ভবাদিগণকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তৈল প্রভৃতি কার্য উৎপত্তির পূর্বেও তিলের মধ্যে অব্যক্তভাবে বর্তমান ছিল।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য যদি বিদ্যমানই

রহিল, তবে তাহাকে উৎপন্ন করিবার জন্য, আবার আমরা প্রযত্ন করি কেন? যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহাকে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা কি বাতুলের চেষ্টা নহে? পরিণামবাদিগণ ইহার উত্তর এইপ্রকারে করিয়া থাকেন যে, যেমন অন্ধকারপূর্ণ গৃহে আমাদের প্রয়োজনীয় কোন বস্তু থাকিলেও, তাহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া, সেই বস্তুর দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না; তাহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ কর্তব্য এই যে, প্রদীপাদির সাহায্যে ঐ বস্তুটিকে অভিব্যক্ত করা। অবশ্য কেহই বলিবে না যে, প্রদীপের দ্বারা সেই বস্তুটির অভিব্যক্তি করিলাম বলিয়া, আমি সেই বস্তুটির উৎপাদন করিলাম; সেইরূপ মাটির মধ্যে ঘটাদিকার্য, বা তিলের মধ্যে তৈলাদিকার্য্যও, অন্ধকারপূর্ণ স্থানে অবস্থিত বস্তুর ন্যায়, যখন অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে, তখন সেই ঘটাদি কার্য বা তৈলাদি কার্যকে অভিব্যক্ত করিবার জন্যই, আমরা প্রযত্ন করিয়া থাকি। এক কথায় বলিতে গেলে কার্যের অভিব্যক্তিই তাহার উৎপত্তি, অসতের বা অলীকের অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি অসম্ভব। যাহা পূর্ব হইতেই সিদ্ধ আছে, তাহারই অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি সম্ভবপর; যাহা অসৎ বা গগনকুসুমের ন্যায় অলীক, তাহার অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি কিপ্রকারে সম্ভবপর?

পরিণামবাদিগণ আরও বলিয়া থাকেন নিকটে বস্তু বর্তমান থাকিলেও যে আমরা সময়বিশেষে তাহাকে দেখিতে পাই না, তাহার হেতু কি? আবরণের সদ্ভাবই বস্তুকে না দেখিবার কারণ নহে কি? আমার পাঁচহাতের মধ্যে ঘট থাকিলেও যদি মধ্যস্থানে একটি প্রাচীর বা পর্দা থাকে, তাহা হইলে, ঐ ঘটটি আমি দেখিতে পাই না, কারণ প্রাচীর বা পর্দারূপ আবরণ দ্বারা ঐ ঘট আবৃত। ঐ প্রাচীর বা পর্দারূপ আবরণকে যে পর্যন্ত অপসারিত করিতে না পারা যায়, সেই পর্যন্ত, ঐ দ্রব্যকে অভিব্যক্ত করিতে পারা যায় না, সুতরাং ঐ আবৃত বস্তুটিকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য ঐ আবরণকে বিনষ্ট করিতে বা সরাইতে হইবে। এই আবরণের

অপসারণ করিবার জন্য আমাদের যে চেষ্টা, তাহা ঐ আবৃত বস্তুর উৎপত্তির কারণ নহে কিন্তু তাহা আবৃত বস্তুর অভিব্যক্তির কারণ; উৎপত্তির পূর্বে মাটির মধ্যে যে ঘট আছে, তাহা অব্যক্তভাবে আছে, তাহার সেই অব্যক্তভাব বা আবরণকে দূর করিবার জন্যই কুম্ভকার প্রযত্ন করে; যে ঘট নাই, যাহা গগনকুসুমের ন্যায় অসৎ, তাহাকে কেহই উৎপন্ন করিতে পারে না; ইহা যেন আমাদের মনে থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, উৎপত্তির পর ঘট যখন আবৃত হয়, সেই অবস্থাতেই ঘটের আবরণ বলিলে আমরা যেমন প্রাচীর বা পর্দা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বুঝিয়া থাকি—সেইরূপ যখন ঘট মৃত্তিকার মধ্যে উৎপত্তির পূর্বে আবৃত থাকে, তখন তাহার আবরণ বলিলে আমরা কি বুঝিব? ইহার উত্তর এই যে, ঘট যেমন মৃত্তিকার অবস্থাবিশেষ, সেইরূপ পিণ্ডভাব বা চূর্ণভাবপ্রভৃতি মৃত্তিকার আরও অনেকগুলি অবস্থা আছে, সেই অবস্থা সমূহও ত মাটি, হয় পিণ্ড, না হয় চূর্ণ, না হয় কাদা, না হয় ঘট, এইরূপ কোন না কোন একটি অবস্থাকে ছাড়িয়া মাটি থাকিতেই পারে না। পিণ্ড, চূর্ণ, কাদা, বা ঘট প্রভৃতি মাটির যে সকল অবস্থা আছে, সেই অবস্থাগুলিকে ছাড়িয়া দিলে মাটির কি অস্তিত্ব আমরা বুঝি? কিছুই না। মাটি বলিলে পিণ্ড বা চূর্ণ প্রভৃতির মধ্যে কোন না কোন একটি ব্যক্ত অবস্থাই আমরা বুঝিয়া থাকি। অর্থাৎ আমরা পিণ্ড প্রভৃতি অবস্থার মধ্যে কোন না কোন একটি অবস্থাকেই বুঝিয়া থাকি, ঐ সকল অবস্থাগুলি ছাড়িয়া দিলে মাটি বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন একটা পৃথক বস্তুকে আমরা যে ধারণা করিতেই পারি না, ইহা কে না বুঝে? তাহাই যদি হইল, অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ ছাড়া কারণের একটা সাধারণ-অস্তিত্ব যদি অসম্ভবই হইল; তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ অবস্থাবিশেষগুলির স্বভাবও এই যে, উহারা পরস্পর পরস্পরের আবরণ করিয়া থাকে। এই দেখ না কেন, যে সময় মাটি পিণ্ডভাবে ব্যক্ত থাকে, তখন তাহার ঘটভাব, চূর্ণভাব, কর্দমভাব প্রভৃতি

অন্য অবস্থাবিশেষগুলি আবৃতই থাকে, অর্থাৎ কারণের যে অবস্থাবিশেষ ব্যক্ত হয়, সেই অবস্থাবিশেষ অন্য সকল অবস্থাগুলিকে আবৃত বা অব্যক্ত করিয়া রাখে। এক কথায় বলিতে গেলে, কারণের ব্যক্ত অবস্থাবিশেষ তাহার অব্যক্ত অবস্থাগুলির আবরক। যেমন, মাটির পিণ্ডাবস্থা যখন ব্যক্ত হয়, তখন তাহার পিণ্ডভাব ব্যতিরেকে আর যত অবস্থা আছে, সেই সকল অবস্থাগুলিই আবৃত হয়। আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে, পিণ্ডভাবরূপ অবস্থা অভিব্যক্ত হইলে, যেমন অপর সকল অবস্থাকেই উহা অব্যক্ত করিয়া রাখে বলিয়া পিণ্ডাবস্থাকে ঐ সকল অবস্থাগুলির আবরণ বলা যায়, সেইরূপ, পিণ্ডাবস্থাকেও সময়বিশেষে অব্যক্ত করা বা তাহার আবরণ হওয়া অন্য অবস্থামাত্রেরই স্বভাব। পিণ্ডভাব ছাড়া মাটির আর যত অবস্থা আছে সেই সকল অবস্থাও আবার পিণ্ডভাবের আবরণ করিতে পারে। যখন পিণ্ডভাব ছাড়া অন্য যে কোন চূর্ণাদি অবস্থা অভিব্যক্ত হয়, সেই অবস্থাই তখন পিণ্ডভাবকে আবৃত করিয়া থাকে ইহা সকলেরই বিদিত আছে। এইক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে, মাটির মধ্যে, যখন ঘট অব্যক্ত থাকে, তখন তাহার আবরণ বলিলে আমরা বুঝিব যে, ঘটভাব ছাড়া কোন না কোন একটি অবস্থা বিশেষ মাটিতে অভিব্যক্ত আছে, এবং সেই অভিব্যক্ত অবস্থাই ঘটের আবরণ, সেই আবরণটি হঠাইতেই পারিলেই, আমাদের সম্মুখে ঘটভাব অভিব্যক্ত হইবে।

এইক্ষণে একটি আপত্তি হইতে পারে যে, পিণ্ডভাবরূপ আবরণকে দূর করিতে পারিলেই যদি ঘটকে অভিব্যক্ত করিতে পারা যায় তাহা হইলে মুদ্গরাঘাতে পিণ্ডভাবটি ভাঙ্গিয়া দিলেই ঘট ব্যক্ত হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, পিণ্ডভাব যেমন ব্যক্ত হইলে ঘটকে আবৃত করে, সেইরূপ চূর্ণভাব ব্যক্ত হইয়া ঘটকে অব্যক্ত করিয়া দিতে পারে। সুতরাং ঘটকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা যে, কেবল পিণ্ডভাবকে অব্যক্ত করিবার বা ভাঙ্গিবার চেষ্টা, তাহা নহে, কিন্তু পিণ্ডভাব ছাড়াও যে যে অবস্থাবিশেষ ঘটের আবরণ হইতে

পারে—সেই সেই অবস্থাবিশেষও যাহাতে অভিব্যক্ত না হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টাও ঘটকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টার মধ্যে পরিগণিত। অর্থাৎ পিণ্ড-ভাবকে ভাঙিবার চেষ্টাও করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে, পিণ্ডভাব ভিন্ন চূর্ণভাবাদি অবস্থাবিশেষের অভিব্যক্তিকেও নিবারণ করিতে হইবে। এই দুইটি চেষ্টা সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইলে, মাটির ঘটভাব অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। এই প্রকার অভিব্যক্তিকেই লোক উৎপত্তি বলিয়া থাকে। আবরক অবস্থাগুলিকে অব্যক্ত করিবার চেষ্টাই লোকে করিয়া থাকে গগন-কুসুমকল্প অসৎ কার্যকে সৎ করিয়া উৎপন্ন করিবার চেষ্টা কেহই করে না। সুতরাং আরম্ভবাদিগণের মতে যে অসতের উৎপত্তি তাহার অর্থ, অব্যক্তের ব্যক্তভাব ছাড়া, অন্য কিছুই হইতে পারে না।

এই সকল পরিণামবাদিগণের সংকার্যসিদ্ধির পক্ষে মোটামুটি যুক্তি। এই বিষয়ে আর অনেক সদ্‌যুক্তি আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সকল যুক্তির বিষয় আলোচনা সম্ভব নহে। সুতরাং এইক্ষণে পরিণামবাদ সম্বন্ধে অবশিষ্টের কয়েকটি কথা বলিয়া আমি পরিণামবাদের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতে চাহি।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, পরিণামবাদ বা সংকার্যবাদ একই বস্তু, এই মতে, এ জগতের কোন বস্তুই বিনষ্ট হয় না সুতরাং কোন বস্তু উৎপন্নও হয় না।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে এই পরিণামবাদই অবলম্বিত হইয়াছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। এই উভয় মতেই কার্যই কারণ, ব্যক্তাবস্থাই কার্য, আর অব্যক্তাবস্থাই কারণ। যে সময়ে জগতের পরিদৃশ্যমান যাবতীয় কার্যই অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই সময়কে প্রলয় বলা যায়। সেই দৃশ্যমান বিশ্বের অব্যক্তাবস্থাই, এই উভয়মতে, প্রকৃতি এই নামে কথিত হয়। প্রকৃতি, প্রধান বা অব্যক্ত এই তিনটি নামের একই অর্থ। সেই অব্যক্তাবস্থারূপ মূল কারণ হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, বিস্তৃত ভাবে তাহার উল্লেখ সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়।

অব্যক্তের স্বরূপ কি? সাংখ্যাচার্যগণের মতে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবের গুণ পরস্পর সমভাবে বিগুমান থাকিলে, ঐ গুণ-ত্রয়কেই অব্যক্ত বা প্রধান বলা যায়। সেই গুণত্রয় কি? সাংখ্য-মতে জগতের যাবং জড় পদার্থই সেই গুণত্রয়ের ন্যূনাধিকভাবে মিশ্রণের ফল। সকল বস্তুই সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ ধর্মের আশ্রয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে সাংখ্যাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, একটি পরমা সুন্দরী যুবতিকে দেখিলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ঐ যুবতি সুখ, দুঃখ এবং মোহের বা অবসাদের আশ্রয় বা মূর্তি। সেই সুন্দরী যুবতি যাহার পত্নী এবং অনুরাগের পাত্রী, তাহার পক্ষে ঐ যুবতি সুখের মূর্তি। কারণ ঐ যুবতিকে দেখিলে তাহার হৃদয়ে সুখের উপলব্ধি হয়। যদি বল, যুবতি সুখের কারণ হইতে পারে,—সুখ হইবে কিরূপে? তাহার উত্তরে সাংখ্যাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, বাহ্য বিষয় সুখময় না হইলে, বাহ্য বিষয়ের অনুভব দ্বারা সুখের আস্বাদন করিতে কেহই সমর্থ হইত না। যুবতির সুখময় স্বরূপ যুবকের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইলে, তাহার অন্তঃকরণেও যে সুখময় সত্ত্বগুণ আছে, তাহারই অভিব্যক্তি হয়। সজাতীয় বস্তুর সহিত সম্পর্ক হইলে অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সজাতীয় বস্তুর অভিব্যক্তি হয়। ইহা দার্শনিকগণের নিকটে অবিদিত নহে। এই দেখ না কেন আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব, পুষ্পও একটি পার্থিব বস্তু; ঘ্রাণেন্দ্রিয় যখন পার্থিব, তখন তাহাতে গন্ধরূপ ধর্ম নিশ্চয়ই আছে, কারণ পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম গন্ধ, যে বস্তু পৃথিবী হইতে উৎপন্ন, গন্ধ তাহাতে থাকিবেই থাকিবে। এক্ষণে দেখ, পুষ্পের গন্ধরূপ যে ধর্ম আছে, তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে হইলে, গন্ধযুক্ত যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, তাহার সহিত সেই পুষ্পের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হওয়াই চাই। আমাদের চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম গন্ধ নহে, উহার ধর্ম রূপ, কারণ চক্ষু পার্থিব নহে, কিন্তু তৈজস; সুতরাং কোন বস্তুতে রূপের উপলব্ধি করিতে হইলে, রূপযুক্ত যে চক্ষু তাহার সহিত, ঐ রূপযুক্ত বস্তুর সন্নিকর্ষ হওয়া চাই। গন্ধযুক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত, রূপের সন্নিকর্ষ হইলেও, আমরা

রূপের উপলব্ধি করিতে পারি না। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, সদৃশ কারণের সহিত সম্পর্ক হইলে, সদৃশ ধর্মের অনুভূতি করিতে পারা যায়। যেমন গন্ধের উপলব্ধি করিতে হইলে, গন্ধযুক্ত যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, তাহার সহিত গন্ধবিশিষ্ট বস্তুর সম্পর্ক হওয়া আবশ্যক। রূপের উপলব্ধি করিতে হইলে, রূপযুক্ত যে ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষুঃ, তাহার সহিত রূপের সন্নিকর্ষ হওয়া আবশ্যক। এই নিয়মানুসারে, যখন আমরা মনে মনে সুখের উপলব্ধি করি, সে সময় সুখময় কোন বস্তুর সহিত, আমাদের মনের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হওয়াই চাই। সুতরাং, যুবকের মনে যে সুখ অব্যক্তভাবে আছে, তাহার উপলব্ধির পূর্বে, যুবকের মনের সহিত, কোন সুখময় বিষয়ের সন্নিকর্ষ আবশ্যক। সেই তরুণী সুন্দরী সুখময় মূর্তিতে যখন যুবকের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, তখনই অনুরাগপূর্ণ যুবা নিজের অন্তঃকরণের সুখময় অবস্থার অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এইপ্রকার, যাহার হৃদয়ে অনুরাগ আছে, অথচ ঐ যুবতি যাহার পত্নী নহে, সেই যুবার পক্ষে, ঐ যুবতি স্বীয় দুঃখময় মূর্তিতে তাহার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়, এবং তদীয় অন্তঃকরণের দুঃখময় অবস্থাকে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। আবার কোন কোন কামাক্ত যুবকের হৃদয়ে, ঐ যুবতি মোহময় বা বিষাদময় মূর্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার হৃদয়ের মোহময় বা বিষাদময় অবস্থাকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া, সাংখ্যাচার্যগণ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, ঐ যুবতি, সুখ দুঃখ ও মোহ এই ত্রিগুণের সমষ্টি ছাড়া, আর কিছুই নহে।

যথাক্রমে সুখ, দুঃখ এবং মোহই, সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই তিনটি নামের দ্বারা অভিহিত হয়। সকল বস্তুই সুখ, দুঃখ, ও মোহরূপ ত্রিগুণে গঠিত। ত্রিগুণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহময় বস্তু, যখন যেরূপে—অর্থাৎ সুখ, দুঃখ বা মোহরূপে, আমাদের নিকটে অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা আমাদের হৃদয়েও, যথাক্রমে সুখ, দুঃখ, বা মোহকেও অভিব্যক্ত করিয়া তুলে। এক কথায় বলিতে গেলে, বাহ্য প্রকৃতির সহিত, আমাদের আন্তর প্রকৃতি, একসূত্রে গাঁথা আছে। বাহ্য প্রকৃতির অভিব্যক্ত অবস্থা আমাদের আন্তর প্রকৃতিতে, সদৃশ অবস্থাকেই অভিব্যক্ত করিয়া থাকে।

সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ যে, কেবল সুখ, দুঃখ এবং মোহ-স্বরূপ—তাহা নহে, ইহাদের আরও অনেক প্রকার স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুখের স্থায়, প্রকাশ, লাঘব ও প্রসাদ—সত্ত্বের স্বভাব। চন্দ্রের নির্মল জ্যোৎস্নার উপর নয়ন পতিত হইলে হৃদয়ে কেমন একটা প্রকাশময়, লাঘবময় এবং প্রসাদময় ভাব উদিত হয়, তাহা আমরা প্রত্যেকেই সময় বিশেষে অনুভব করিয়া থাকি। কেন এমন হয়? ইহার কারণ এই যে, চন্দ্রের জ্যোৎস্না ত্রিগুণ হইলেও তাহাতে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব অধিক, তাহাতে রজোগুণ এবং তমোগুণের অবস্থা অভিভূত। যে বস্তুর প্রসাদময়, লাঘবময় এবং প্রকাশময় ভাব সর্বদাই অভিব্যক্ত, তাহার সহিত যখনই আমার মনের সম্বন্ধ হয় এবং মন তন্ময়ভাবে বিভোর হয়, তখন আমাদের মনের উপাদান যে সত্ত্বগুণ, তাহাও অভিব্যক্ত হয়; সুতরাং আমাদের মনে তখন প্রসাদময় লাঘবময় ও প্রকাশময় ভাব অনুভূত হয়। এইরূপ রজোগুণেরও, দুঃখ ছাড়া আরও কতকগুলি স্বভাব আছে, যথা, চাঞ্চল্য বা ক্রিয়া, সঙ্গপ্রবণতা, পরিবর্তনপক্ষপাতপ্রভৃতি। এই সকল স্বভাব, যে-সকল বাহ্য বস্তুতে ব্যক্ত হয়, সেই সকল বস্তুর সহিত আমাদের মনের সম্পর্ক হইলে, আমাদের মনেও ঐ সকল ভাবের অনুভূতি হয়। তমোগুণেরও বিষাদ ছাড়া আরও অনেক স্বভাব আছে, যথা, জড়তা, অবসাদ, মোহ, আবরণ ও অব্যক্তপক্ষপাত। এই সকল ভাবগুলি যে সকল বাহ্য বস্তুতে অভিব্যক্ত হয়, তাহার সহিত আমাদের অন্তঃকরণের সম্পর্ক হইলে, সময়ে সময়ে, আমরাও ঐ সকল ভাবের অনুভূতি করিয়া থাকি।

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাক্। সেই ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণময় অব্যক্ত, যে সময়, বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের মধ্যে, রজোগুণ যে সময় প্রবল হইয়া তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণকে বৈষম্যযুক্ত করিয়া তুলে সেই সময়, সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণ অল্প বা বিস্তরভাবে অভিভূত হয়, অথচ কার্যোন্মুখও হয়। এই গুণের

বৈষম্যই, বিশ্বসৃষ্টির প্রথম অবস্থা। এই অবস্থার পরই, সেই ত্রিগুণপ্রকৃতি, 'মহত্তত্ত্ব বা মহান্' এই নামে প্রথিত যে কার্যাবস্থা, তদ্রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই মহত্তত্ত্ব কি? জগতে যত জীবাত্মা আছে, সেই সকল জীবাত্মার অতিসূক্ষ্ম অন্তঃকরণ বা সমষ্টিবুদ্ধিশক্তিই সাংখ্যমতের মহত্তত্ত্ব, বা মহান। সৃষ্টির পূর্বাবস্থায়, আত্মার এই সমষ্টি বুদ্ধিশক্তির বিকাশ না হইলে, এই বিচিত্র কৌশলময় জড় জগৎ কিছুতেই সৃষ্ট হইতে পারে না—এই প্রকার সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা থাকা নিবন্ধনই, সাংখ্যাচার্যগণ জীবসমূহে সমষ্টিবুদ্ধি শক্তিকেই অব্যক্তপ্রকৃতির সর্বপ্রথম ব্যক্তাবস্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

আমাদের দার্শনিকগণ অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, এ জগতের যে কার্যেই একটু শৃঙ্খলা বা নিয়মকৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কার্যই যে বুদ্ধিপূর্বক সৃষ্ট হয়, তাহা সকল স্থলেই আমরা দেখিতে পাই। একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ, একটা বড় পুল, রেলগাড়ি, ট্রামগাড়ি প্রভৃতি শৃঙ্খলাময় ও কৌশলপূর্ণ নিয়মযুক্ত কার্যগুলির স্বভাব যাঁহারা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন যে ঐসকল কার্য অগ্রে কোন মনুষ্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ না করিয়া, একেবারে আপনা আপনাই হইয়া পড়িয়াছে? কখনই নহে, কারণ আমরা সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, এই সকল কৌশলময় কার্যগুলিকে, কোন সুদক্ষ ব্যক্তি, কল্পনার সাহায্যে, প্রথমে তাহার মনের মধ্যে ঠিক করিয়া গড়িয়াছিল, পরে কতকগুলি বাহ্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সে, তাহার মানস কার্যকে—বাহ্যকার্যাকারে পরিণত করিয়াছে। সেইরূপ, এই বিচিত্র কৌশলময় জগৎ যাহার প্রত্যেক পরমাণু হইতে বিশাল পর্বত পর্যন্ত অনন্ত বৈচিত্র্যময় বস্তুনিচয়, উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়-রূপ নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ, এবং সকলে, সকলের জন্য, সকলের সহিত মিলিত হইয়া, প্রতিক্ষণ বৈচিত্র্যময় ভবিষ্যতের দিকে একই নিয়মে অগ্রসর হইতেছে, এই কৌশলময় জগৎও যে, ইহার বাহ্য ভাবে অভিব্যক্তির পূর্বে, কোন না কোন বুদ্ধিবৃত্তিতে অঙ্কিত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

সেই বুদ্ধিশক্তি কাহার? যে ভোক্তা সেই ত জ্ঞাতা হইয়া থাকে, সুতরাং, ভোক্তা ত জীবই, এবং ঐ বুদ্ধিই ত জীবেরই বুদ্ধি, সেই জীবও আবার অসংখ্য, অতএব অসংখ্য জীবের অসংখ্য বুদ্ধিশক্তির অভিব্যক্তিই যে এই বাহ্য প্রপঞ্চের সৃষ্টির পূর্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ করিবার বড় একটা হেতু দেখা যায় না।

মহত্তত্ত্ব সৃষ্টির পরই, সেই অব্যক্ত অহংকাররূপে অভিব্যক্ত হয়। বুদ্ধিশক্তির বিকাশের পরই, আমাদের অহম্ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই সর্বানুভবসিদ্ধ নিয়ম দেখিয়াই যে, সাংখ্যাচার্যগণ মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্বের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অহংতত্ত্বের অভিব্যক্তির পরই, আমাদের ইন্দ্রিয়াভিমান এবং বিষয়াভিব্যক্তি হয়। এই কারণে, সাংখ্যদর্শনে, অহংতত্ত্ব হইতে দ্বিবিধ সৃষ্টিরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—ইন্দ্রিয়সৃষ্টি এবং স্থূল ভূতসমূহের উপাদানরূপ সূক্ষ্ম ভূতনিবহের সৃষ্টি। সেই ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়—পাঁচটি চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, শ্রোত্র ও ত্বক্‌। কর্মেন্দ্রিয়ও পাঁচটি, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন বলিয়া যে ইন্দ্রিয়টি আছে, তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই উভয়েরই পরিচালক, এই কারণে, সাংখ্য দর্শনে মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় এই দ্বিবিধ বিশেষণের দ্বারাই, পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে।

অহংতত্ত্ব—বিষয় বা ভোগাবস্তুরূপে পরিণত হইলে—তাহাকে দুই ভাগে নির্দেশ করা যায়, যথা, প্রথম, সূক্ষ্মভূত বা পঞ্চতন্মাত্র; দ্বিতীয়, স্থূলভূত বা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, এবং আকাশ এই পঞ্চভূত। ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের যে সূক্ষ্ম বা কারণাবস্থা, তাহাকেই সাংখ্যদর্শনে তন্মাত্র বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সেই তন্মাত্রও পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র এবং শব্দতন্মাত্র। পৃথিবীরূপ স্থূলভূত গন্ধতন্মাত্রেরই অভিব্যক্তাবস্থা। এই প্রকার অন্য চারিটি মহাভূত, অর্থাৎ

জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, রসতন্মাত্র প্রভৃতি চারিটি সূক্ষ্মভূতের বা তন্মাত্রের অভিব্যক্তাবস্থা।

এই ত গেল অব্যক্ত ও ব্যক্ত, অথবা কারণ ও কার্যরূপে, জড় জগতের পরিণতিক্রম। এই কয়টি পদার্থ লইয়াই জড় জগৎ। যে কোন বস্তুই জড় বলিয়া পরিগণিত, তাহা প্রকৃতি হইতে মহাভূত পর্যন্ত কোন না কোন এক তত্ত্বের মধ্যে প্রবিষ্ট। এই ব্যক্তাব্যক্তময় জড়জগৎ, আপনা হইতে আপনি, প্রকাশিত হইতে পারে না। যে প্রকাশের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহারা প্রকাশিত হইয়া থাকে সেই প্রকাশশক্তি বা চৈতন্যই, সাংখ্য মতের আত্মা। এই প্রকাশময় আত্মা নিত্য এবং অপরিণামী। সর্বদা প্রকাশ পাওয়াই ইহার স্বভাব। এই প্রকাশশীল বস্তু, অবিবেকবশতঃ জড়ের সহিত মিশিয়া, যখন ব্যবহারের গোচর হয়, তখনই তাহাকে, আমরা সংসারী বা বদ্ধজীব বলিয়া নির্দেশ করি। এই প্রকাশশক্তির সহিত, জড়শক্তির অবিবেকমূলক মিলনই সংসার, এবং সংসারই—সকলপ্রকার দুঃখের মূল। আমার দেহ, আমি কৃশ, আমি দুঃখী, আমি পিতা, আমি পুত্র, এই প্রকার যে-সকল জ্ঞান, তাহাই ত সংসারের সকল অনর্থের মূল।

আমি এই শব্দের প্রতিপাদ্য জ্ঞানময় বস্তুর সহিত, দেহপ্রভৃতি জড়বস্তু, অভিন্নভাবে মিলিত হইয়াই, সকল প্রকার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশপ্রভাবে, যখন জীবের এই প্রকার অবিবেকমূলক ভ্রম-জ্ঞান নিবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ প্রকাশময় অবিকারী আত্মার সহিত, পরিণামী ও অশুদ্ধ জড়ের, বাস্তবসম্বন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না—এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত, যে সময়, আমাদের আর দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মত্বাভিমানের উদয় না হইবে, সেই সময় হইতেই আমাদের সকল প্রকার দুঃখের সহিত সম্বন্ধ নিবৃত্তি হইবে। তখন অব্যক্ত বা প্রকৃতি আর ব্যক্তভাবে প্রকাশ পাইয়া আমাদিগকে জড়রাজ্যে প্রবেশ করাইতে পারিবে না। আপনার উপর জড়ভাবের আরোপ করিয়া, জড় রাজ্যের মধ্যে আত্মার প্রবেশই, আত্মার

বদ্ধভাব ; এই আত্মার বদ্ধভাব দূর করিবার একমাত্র উপায় এই যে, আত্মা ও জড়ের প্রকৃত স্বভাব কি তাহাই ভাল করিয়া বুঝা। সেই স্বভাব বুঝিতে হইলে, পরিণামবাদ বা সৎকার্যবাদটি ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। এই সৎকার্যবাদের যুক্তিগুলি ভাল করিয়া বুঝিলে, জীব ক্রমে আত্মা এবং অনাত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয়, এবং সেই বুঝিবার ফলে, সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ নির্বাণমুক্তিকে লাভ করিয়া থাকে।

এতক্ষণে পরিণামবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ হইল। বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ বুঝিতে হইলে, আরম্ভবাদ এবং পরিণামবাদের তত্ত্ব খানিকটা জানা উচিত। যতটুকু না জানিলে মায়াবাদ বুঝা কঠিন হয়, আরম্ভবাদের এবং পরিণামবাদের ততটুকু পরিচয়ই, আমি এই প্রবন্ধে দিতে বাধ্য হইয়াছি ; তাহা ছাড়া আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ সম্বন্ধে আরও বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, এস্থলে তাহা আলোচিত হইল না। আশা করি সহৃদয় পাঠক, আমার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এই আরম্ভবাদ এবং পরিণামবাদের ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা জন্য, আমার ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ

মায়াবাদ, বিবর্ত্তবাদ বা অদ্বৈতবাদ, একই সিদ্ধান্তের নাম। আচার্য শঙ্কর, এই মতের প্রাধান্য ব্যবস্থাপন করিয়া, ভারতের দর্শনশাস্ত্রকে অন্যান্য সকল দেশের সকল দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে, অতি উচ্চপদে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই মায়াবাদ আমাদের দেশে নূতন নহে, উপনিষদে আমরা মায়াবাদের অঙ্কুর দেখিতে পাই। বৌদ্ধদার্শনিকযুগে এই মায়াবাদের প্রসার ও উচ্ছৃ-ঙ্খলতা পর্য্যাপ্তভাবে উপলব্ধ হয়। আচার্য শঙ্কর এই মায়াবাদের পরিপূর্ণতা ও সুশৃঙ্খলাসাধন করিয়া, ইহাকে, সর্ব দার্শনিকমতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

মায়াবাদ অতি প্রাচীন। উপনিষদের মধ্যেই মায়াবাদ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কর্ম্মবহুল বৈদিকযুগে ভারতে দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা কর্ম্মশাস্ত্রই অতি প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। এই কারণে বৈদিকযুগে মায়াবাদ আর্য-গণের মনোরাজ্যে পর্য্যাপ্তরূপে অধিকার লাভে সমর্থ হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতে কর্ম্মপ্রবণতা হ্রাস পায়, দার্শনিকতা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। বেদের কর্ম্মকাণ্ড সেই সময় হইতেই ভারতে লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদ বা মহাযান, একদিন, পৃথিবীর যাবতীয় দার্শনিকগণের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইত্‌সিঙ্, ফাহিয়ান্ এবং হুয়েন্-সাঙের ন্যায় অধিকন্তু বৈদেশিকগণ, এই মহাযান মতে পাণ্ডিত্য লাভ করিবার আশায়, ভারতের বৌদ্ধভিক্ষুকগণের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ মহাযানে মায়াবাদের প্রচুর প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এই বৌদ্ধ মায়াবাদ একেবারে শূন্যের উপর স্থাপিত হওয়ায়, উহা ভারতের ব্রাহ্মণগণের হৃদয়রাজ্যে অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্যই, ভারতে বৌদ্ধমায়াবাদ দৃঢ়মূল হইয়া জমিতে পারে নাই। আচার্য শঙ্কর, এই বৌদ্ধবাদের শূন্যরূপ ভিত্তির অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিয়া, সেই সর্বসত্তাময় আত্মার

আত্মার জ্ঞানকেই, এই মায়াবাদের দৃঢ়ভিত্তিরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া হিন্দুধর্ম, হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু দার্শনিকতার প্রকৃত সমুজ্জ্বল চিত্র অমরভাবে জগতে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই কারণে এই মায়াবাদ বহু প্রাচীন হইলেও, ইহা শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ বলিয়া, বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

এই মায়াবাদই, শঙ্করাচার্যের সময় হইতে এপর্যন্ত, ভারতের প্রায় যাবতীয় প্রধান প্রধান দার্শনিকগণের, জীবনের ও মরণের অবলম্বন একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এই মায়াবাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে; সুতরাং যতদূর সংক্ষেপে ইহার পরিচয় দেওয়া আমার সামর্থ্যে কুলাইবে, সেইভাবে ইহার পরিচয় দিবার জন্য আমি অগ্রসর হইতেছি।

মায়াবাদের আরও একটি নাম অনির্বাচ্যবাদ। আমার বিবেচনায়, অনির্বাচ্যবাদ এই একটি শব্দই মায়াবাদের যথার্থ পরিচয় দিতে সমর্থ। কেন, তাহা বলি। আচ্ছা, মায়া কাহাকে বলা যায় বল দেখি? যাহা দেখি, সুতরাং যাহার স্বরূপ অপলাপ করিবার শক্তি আমার নাই, অথচ বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, যাহার স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইবার উপযুক্ত শব্দ, আমরা জুটাইয়া উঠিতে পারি না, সেই বস্তুকেই আমরা অনির্বাচ্য বলিয়া থাকি। মায়াই ত অনির্বাচ্য। ঐন্দ্রজালিক মায়াবী তোমার চক্ষুর সম্মুখে আমের আঁটি পুঁতিয়া, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে, একটি প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ নির্মাণ করে। সেই মায়াকল্পিত বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফল দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, ঐ আম্রবৃক্ষ হইতে সত্য আম্রবৃক্ষের কোন পার্থক্য আছে? সেই ঐন্দ্রজালিকের আম্র বৃক্ষকে আমরা কি বলি? আমরা বলি, ঐ বৃক্ষ মায়াময়, উহা অনির্বাচ্য— কেন এ প্রকার বলি? সেই বৃক্ষের সত্তাকে আমি একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না; কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই, ঐ বৃক্ষকে আমি দেখিতেছি। যাহাকে দেখিতেছি, তাহা যে সৎ নহে, তাহা কি প্রকারে বলিব? অথচ,

অর্দ্ধ ঘন্টা কালের মধ্যে, একটি শুষ্ক বীজের মধ্য হইতে পত্রপুষ্পফলশোভিত অতবড় একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ, যে কি প্রকারে হইতে পারে, ইহা আমি নিজেই বুঝিতে পারি না। সুতরাং, অপরকে তাহা বুঝাইব কি প্রকারে? যাহাকে সৎ বলিয়া বুঝিয়া থাকি, অথচ যুক্তির দ্বারা, যাহাকে সৎ বলিয়া সিদ্ধ করিতে পারি না, সেই বস্তুই ত অনির্বাচ্য, তাহাই ত মায়া।

এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র ও বিভিন্নস্বভাব সংসারের প্রতি চাহিতে চাহিতে, ইহার স্বরূপ কি, তাহা বুঝিবার জন্য মানুষ যখন উৎসুক হয়, এবং সেই ঔৎসুক্যের বশে প্রণিধানসহকারে ভাবিতে আরম্ভ করে, তখন সে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় বল দেখি? সে তখন বুঝিয়া থাকে যে, এই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বুঝিবার শক্তি তাহার নাই। সে স্পষ্টই বুঝিয়া থাকে যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রভাবে তাহার সম্মুখে প্রতিভাত হয় তখন ইহাকে একেবারে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। অথচ এই বিশ্ব যে একেবারে সৎ, তাহাও পূর্বাপর ভাবিয়া বিশ্বাস করিতে, তাহার প্রবৃত্তি হয় না। এই কারণে, সেই ব্যক্তি তখন বাধ্য হইয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান সংসার অনির্বাচ্য ইহা মায়াময় ছাড়া অন্য কিছুই হইতে পারে না, ইহা সত্য সত্যই ইন্দ্রজাল! ইহাই হইল, মায়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই মায়াবাদের বিস্তৃত তত্ত্ব জানিবার পূর্বে, পূর্বাধ্যায়ে প্রদর্শিত পরিণামবাদের উপর, মায়াবাদিগণ যে সকল দোষ অর্পণ করিয়া থাকেন, প্রথমে তাহারই আলোচনা আবশ্যক।

পরিণামবাদিগণ বলেন যে, কার্যসমষ্টিই কারণ, কার্য ছাড়া কারণের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই, একই বস্তু অব্যক্ত হইলে তাহাকে কারণ কহে, এবং ব্যক্ত হইলে তাহাই কার্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। একটু বিচার করিয়া দেখা যাক যে, এই মতটি কতদূর প্রমাণসংগত হইতে পারে। আমরা অনেক সময় এরূপ দেখিয়া থাকি যে, আমাদের নিকট কোন একটি বস্তু সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক তাহা সৎ নহে। একখণ্ড শুক্তি (ঝিনুক) কে

একটু দূর হইতে দেখিলে, সময়বিশেষে বোধ হয়, যেন উহা শুক্তি (ঝিনুক) নহে, কিন্তু রজত। শুধু যে ভাসা ভাসা ভাবে বোধ হয় মাত্র, তাহা নহে; অনেক সময়, রজত বুঝিয়া, উহাকে লইবার জন্য কেহ কেহ হস্ত পর্যন্তও প্রসারিত করিয়া থাকে।

বাস্তবিক যাহা রজত নহে, কিছুকালের জন্য, আমি যদি তাহাকে রজত বলিয়া বুঝি, তাহা হইলেই কি কখনও উহা রজত হইতে পারে? কখনই নহে। সেইরূপ, এই যে, আমাদের ঘট পট মঠ প্রভৃতির জ্ঞান, যাহাকে, যথার্থ জ্ঞান বলিয়া আমাদের একটা ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা যে ঐ শুক্তিতে রজত-জ্ঞানের ন্যায় ভ্রম নহে, তাহা কে বলিতে পারে? ঐ যে শুক্তিতে রজত-জ্ঞান হয় তাহার প্রকৃত কারণ কি তাহার একটু আলোচনা এখানে করা আবশ্যক।

যখনই আমাদের শুক্তিতে রজত-বুদ্ধি হয়, তাহার ঠিক পূর্বক্ষণে, ইহা শুক্তি, এই প্রকার জ্ঞান থাকিলে, তাহাতে যে আমাদের রজত-বুদ্ধি হইতে পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, শুক্তির স্বরূপ না জানা, তাহাকে রজত বলিয়া বুঝিবার কারণ। মায়াবাদিগণ বলেন, এই যে শুক্তিকে না বুঝা, বা শুক্তির অজ্ঞান, উহা যে কেবল জ্ঞানের অভাব, তাহা নহে, কিন্তু উহা একটি ভাবপদার্থ, এবং উহাকেই শাস্ত্রে অবিদ্যা কহে। ঐ অবিদ্যা, ঐ অজ্ঞানকে, আমরা তদীয় দুইটি কার্যদ্বারা ভাব বস্তু বলিয়া অনুমান করিতে পারি। সে দুইটি কার্য কি? প্রথম কার্যটির নাম আবরণ, দ্বিতীয় কার্যটির নাম বিক্ষেপ। আবরণ কাহাকে বলে? যে বস্তুর জ্ঞান না থাকে, বা যাহাকে আমরা দেখিতে না পাই সেই বস্তু নাই অথবা সেই বস্তু আমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছে না এই যে দ্বিবিধ ব্যবহার আমরা করিয়া থাকি, এই ব্যবহারই আবরণ। বিক্ষেপ কাহাকে বলে? যে বস্তুকে অজ্ঞান আবৃত করে, সেই বস্তুর যাহা বিপরীত ধর্ম, সেই ধর্মকে সেই বস্তুর উপর আরোপিত করাই বিক্ষেপ। যখন আমরা শুক্তিকে না

দেখিতে পাই, সেই সময় "এখানে শুক্তি নাই বা আমার নিকটে উহা প্রকাশ পাইতেছে না" এই প্রকার ব্যবহার, আমরা সকলেই করিয়া থাকি। এই ব্যবহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, অজ্ঞান শুক্তিকে আবৃত করিয়াছে। তাহার পরই, শুক্তির যাহা ধর্ম নহে, সেই ধর্মকে শুক্তির উপর আমরা আরোপ করিয়া থাকি ; অর্থাৎ "ইহা শুক্তি" এইরূপ ব্যবহার না করিয়া "ইহা রজত" এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, শুক্তির অজ্ঞান, শুক্তির প্রকৃতস্বরূপকে আবৃত করিয়া, রজত ব্যবহারের গোচর করিয়া থাকে। এই প্রকার ব্যবহার করাইবার যে শক্তি অজ্ঞানে আছে, তাহাকেই মায়াবাদিগণ বিক্ষেপ-শক্তি বলিয়া থাকেন।

অজ্ঞান বলিলে একেবারে জ্ঞানের অভাব, বা শূন্য বুঝায় না। কারণ, অজ্ঞান বস্তুকে যেমন আবৃত করে, তেমনই অন্যভাবে প্রকাশও করে। অভাব বা শূন্য, কাহারও আবরণ করিতে পারে না, কাহাকে অন্যভাবে প্রকাশিতও করিতে পারে না। এই দুইটি কার্য, ভাবপদার্থের দ্বারাই সাধিত হয়। অজ্ঞান যখন আবরণ এবং বিক্ষেপ এই দুইটি কার্যই করিয়া থাকে, তখন এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাকে কি প্রকারে অভাব বা শূন্য বলিয়া স্বীকার করিব? এই প্রকার যুক্তি দ্বারা মায়াবাদিগণ অজ্ঞানকে ভাবপদার্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন অর্থাৎ ইঁহাদের মতে, অবিদ্যা বা অজ্ঞান গগনকুসুমের ন্যায় যে অলীক তাহা নহে ; এবং ঘটশূন্য দেশে ঘটের অভাবের ন্যায়, জ্ঞানের অভাবই যে অজ্ঞান বা অবিদ্যা, তাহাও নহে।

ফলে এই স্থির হইল যে, অজ্ঞানের দুই শক্তি, আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি। এক্ষণে দেখিতে হইবে, আমরা যে একই মাটিকে কখনও ঘট বলিয়া ব্যবহার করি, কখনও বা পিণ্ড বলিয়া ব্যবহার করি, আবার কখনও বা চূর্ণ বলিয়া ব্যবহার করি—সেই পিণ্ডভাব, চূর্ণভাব বা ঘটভাব যে মৃত্তিকার প্রকৃত স্বরূপ তাহা কিরূপে বুঝিব? তুমি বলিবে, মাটি যখন ঘট বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে, তখন ঘট মাটির স্বরূপ না হইবে কেন?

ইহার উত্তর এই যে, এই নিয়মানুসারে শুক্তিরও স্বরূপ রজত না হইবে কেন? যেমন, তোমার মতে সময়বিশেষে মাটি ঘট বলিয়া প্রতীত হয় বলিয়া, মাটির স্বরূপ ঘট হইয়া থাকে, সেইরূপ সময়বিশেষে ঝিনুকও রজত বলিয়া প্রতীত হয় বলিয়া, রজত ঝিনুকের স্বরূপ, ইহা স্বীকার করাই ত উচিত। বাস্তবিক কিন্তু কেহই স্বীকার করে না যে, রজত ঝিনুকের স্বরূপ। অথচ, সময়বিশেষে, লোকে ঝিনুককে রজত বলিয়া ব্যবহারও করিয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঝিনুককে রজত বলিয়া আমরা বুঝি, অথচ ঝিনুককে রজত বলিয়া স্বীকার করি না; মাটিকেও ঘট বলিয়া বুঝি, কিন্তু ঘট যে মাটির একটি স্বরূপ, তাহাও মানিয়া থাকি—এ বৈষম্য কেন? প্রকৃত বস্তুকে না বুঝিয়া, তাহাকে বিপরীত ভাবে বুঝাই ত আমাদের স্বভাব। আরও এক কথা, পরিণামবাদিগণ বলেন যে, ঘটও যেমন মাটির স্বরূপ, পিণ্ড বা চূর্ণ প্রভৃতি অবস্থাও, সেইরূপ, মাটির স্বরূপ। এই প্রকার সিদ্ধান্তের সহিত, আমরা কিন্তু, কিছুতেই যুক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারি না। কেন তাহা বলি। মাটি ও ঘট যদি একই বস্তু হয়, তাহা হইলে, যাহাকে যাহাকে আমরা মাটি বলিয়া ব্যবহার করি, তাহা সকলই যে ঘট, ইহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, কারণ চূর্ণও মাটি, পিণ্ডও মাটি, ঘটও মাটি—সুতরাং চূর্ণ, ঘট এবং পিণ্ড, এ সকলই মাটি। মাটি হইতে মাটির যদি কোন ভেদ না থাকে, তাহা হইলে, পিণ্ড হইতে ঘটের ভেদ থাকিবে কেন? মাটি এক, অথচ মৃন্ময় ঘট ও মৃন্ময় পিণ্ড এক নহে—ইহা কি প্রকারে স্বীকার করিব? এই কারণেই মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, কার্য কারণ হইতে অভিন্নও নহে, ভিন্নও নহে। কার্য যে কারণ হইতে অভিন্ন নহে, তাহা ত ঘট ও পিণ্ডের অভেদ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। এক্ষণে, কারণ হইতে কার্য যদি ভিন্ন বল, তাহা হইলে, আরম্ভবাদীর মত অবলম্বন করিতে হয়। আরম্ভবাদিগণের মতে যে কার্য-কারণ ভাবের কোনপ্রকারেই নির্বাচন হইয়া উঠে না, তাহা পূর্বে

ভাল করিয়া দেখান হইয়াছে। কারণ হইতে কার্য যে একবারে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন, তাহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু, তাহা হইলে, কারণ হইতে অভিন্ন কার্যগুলির মধ্যে, সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে পরস্পর-ভেদ, তাহারও অপলাপ করিতে হয়। এই কারণেই মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, কার্য অনির্বাচ্য। কার্য ঠিক যে কারণ তাহাও নহে, আবার তাহা যে কারণ হইতে অত্যন্ত পৃথক, ইহাও বলা যায় না। ফলে দাঁড়াইল যে, কার্য মায়াময়। যাহার নির্বচন করিতে পারি না, অথচ যাহার সত্তাকে একেবারে উড়াইয়াও দিতে পারি না, তাহারই নাম ত মায়া। জগতের যত কার্য আছে, সকলই যদি পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে অনির্বাচ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে, এই জগতের যাবতীয় কার্যই যে মায়া, তাহা কেন না স্বীকার করিবে ?

আবার স্বপ্নের দিকে চাহিয়া দেখ। কি দেখিবে ? কত শত শত বৈচিত্র্যময় দৃশ্যই না প্রতিভাত হইতেছে। সেখানে কিন্তু এক দর্শন ছাড়া সকল দৃশ্য সবই মিথ্যা। যতক্ষণ স্বপ্নাবস্থা, ততক্ষণই ঐ সকল অনন্তবৈচিত্র্যময় দৃশ্যরাজির সত্তা। স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিচিত্র দৃশ্যরাশি কোথায় মিশিয়া যায়। উপাদান-কারণ বল, নিমিত্ত-কারণ বল, বা অসমবায়ী কারণ বল, কোন কারণই নাই ; অথচ, রাশি রাশি কার্য লইয়া, জীব ব্যবহার করিতেছে ! ব্যবহারের বিষয় অলীক। অথচ ব্যবহার সত্য। কি অদ্ভুত ব্যাপার ! যেমন চিরস্থায়ী জাগরণের উদয়ে, ক্ষণিক স্বপ্নের বিলয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুনিচয়ও গগনকুসুমের ন্যায় অলীক হইয়া পড়ে, সেইরূপ, কে বলিতে পারে যে, আমাদের এই জাগরণরূপ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবার পর, এই জাগরণ অপেক্ষা বৃহত্তর জাগরণাবস্থা আবার আসিবে না ? এবং সেই মহাজাগরণের দিনে, এই বর্তমান-জাগরণরূপ বৃহৎ স্বপ্নও, গগনকুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া প্রতীত হইবে না ?

অলীক কাহাকে বলে ? যাহা পূর্বে ছিল না এবং যাহা পরেও থাকিবে

না, কেবল মধ্যে কিছুকালের জন্য যাহা ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকে, তাহারই নাম ত অলীক। এই অলীক বস্তুর স্বভাব কি? ইহা একরূপে থাকে না, পরিবর্তনই ইহার স্বভাব। এ জগৎ অলীক, কারণ ইহা পরিবর্তনশীল। ইহার কোনরূপই স্থায়ী নহে। ইহা বিনাশী। ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা কেহই নির্বাচন করিতে পারে না। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে। কারণ, ইহা যদি সং হইত, তাহা হইলে ইহার বিনাশ হইত না, এবং সর্বদা একরূপেই থাকিত। ইহা যে অসৎ তাহাও বলা যায় না, কারণ, যাহা অসৎ, তাহা কখনও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর হইতে পারে না। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, তাহাই ত মায়া। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চও মায়া।

তবে কি এই জগতে সকল বস্তুই মায়াময়? সুতরাং অলীক বা গগনকুসুম তুল্য? তাহা নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, যাহা পরিবর্তনশীল, অচিরস্থায়ী এবং বিনাশি, তাহাই মায়াময় বা অলীক। একটি বস্তু ছাড়া, এ সংসারের আর সকল বস্তুই পরিবর্তনশীল ও বিনাশী, সুতরাং কেবল এই বস্তুটিই মায়াময় বা অলীক নহে। কি সেই বস্তু? মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই বস্তুই আমাদের আত্মা। আত্মা, ব্রহ্ম ও জ্ঞান, মায়াবাদিগণের মতে, একই বস্তু।

বিষয়, অর্থাৎ ঘট পট প্রভৃতি দৃশ্য বস্তু, জ্ঞানের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। দৃশ্য বস্তু, যে পর্যন্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত না হয় সেই পর্যন্ত তাহার অস্তিত্বের প্রতি কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না। আমার জ্ঞান যাহাকে প্রকাশিত করে, সেই বস্তুই আমার কাছে সৎ বলিয়া স্বীকৃত। যাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত নহে, তাহার অস্তিত্ব কেহই স্বীকার করে না, করিবার সম্ভাবনাও নাই।

যে জ্ঞানের দ্বারা জগতের সকল বস্তুই প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞান কিন্তু সর্বদাই একরূপ। তাহার স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। ঘট, পট, মঠ

প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয়গুলি বিভিন্ন হইলেও, জ্ঞান কিন্তু সেই এক প্রকাশময় স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন স্বরূপে আমাদের নিকট পরিচিত নহে। ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট হইতে পটজ্ঞানের বিষয় পট পৃথক্ বস্তু। কিন্তু ঘটজ্ঞান ও পট-জ্ঞানের মধ্যে স্বরূপগত যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা কেহই প্রমাণ করিতে পারেন না। জ্ঞানের বিষয়গুলি পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক হইতে পারে, কিন্তু বিষয়াংশকে ছাড়িয়া দিয়া, শুদ্ধ জ্ঞান বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহার মধ্যে যে পরস্পর কোন পার্থক্য আছে, তাহা কি কেহ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন? কখনই না।

আরও একটি বিষয় দেখিতে হইবে যে, এ জগতে, আমাদের যত প্রকার জ্ঞান হয়, সেই সকল জ্ঞানেই দুইপ্রকারের পদার্থ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। একপ্রকার পদার্থ সামান্য বা অনুবৃত্ত, আর একপ্রকার পদার্থ বিশেষ বা ব্যাবৃত্ত। এই দেখ না কেন, আমাদের যতপ্রকার জ্ঞান হয়, সে সকল জ্ঞানই, এই সামান্য ও বিশেষ, বা অনুবৃত্ত ও ব্যাবৃত্তরূপ দুইটি বস্তুকে নিয়তই প্রকাশ করিয়া থাকে। ঘট আছে, পট আছে, নীল আছে, পীত আছে, এইরূপ আমাদের সকল জ্ঞানেই, আমরা দেখিতে পাই যে, এই অংশ দুইটি প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'আছে' এই শব্দের দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তাহা সত্তা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সত্তাই অনুবৃত্ত বা সামান্য পদার্থ। আর ঘট পট মঠ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা, আমরা যে সকল পদার্থ বুঝি, তাহা সকলই বিশেষ বা ব্যাবৃত্ত পদার্থ। আমাদের এমন কোন জ্ঞান হইতেই পারে না যাহা দ্বারা এই সত্তারূপ সামান্য পদার্থ প্রকাশিত হয় না। যে কোন বিশেষ বস্তু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হউক না কেন, সত্তারূপ সামান্য বস্তু ছাড়িয়া, তাহাদের, কোন বিশেষরূপকে আমরা কিছুতেই হৃদয়ংগম করিতে সমর্থ হই না। ইহাই হইল আমাদের জ্ঞানের স্বভাব।

ঘট বলিলে আমরা বুঝি যে, হয় ঘট ছিল, না হয় ঘট আছে, কিম্বা ঘট হইবে। 'ছিল', 'আছে' বা 'হইবে' এই তিনটি শব্দের দ্বারা আমরা ঘটের

সত্তা ছাড়া আর কি বুঝি? একই ঘটের সত্তাকে, আমরা, কখন অতীতকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করি, কখন বা সেই সত্তাকে বর্ত্তমানকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করি, অথবা সেই সত্তাকে, আমরা কোন সময়ে, ভবিষ্যৎ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করি—এইমাত্র বিশেষ; কিন্তু, বস্তুর অর্থাৎ বিশেষ বস্তুর সত্তাকে না বুঝিয়া, কোন সময়েই যে, আমরা বিশেষ বস্তুকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না—এ-কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে একবাক্যে স্বীকার করিতেই হইবে।

ঘট পট মঠ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে তাহা সকলই বিশেষ হইলেও, সত্তারূপ একটা সামান্য বস্তুর সহিত মিলিত হইয়াই আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। কারণ, আমরা সকলেই বলিয়া থাকি বা বুঝিয়া থাকি যে, ঘট সৎ, পট সৎ, মঠ সৎ, জল সৎ, পৃথিবী সৎ, আকাশ সৎ, বায়ু সৎ। এক্ষণে দেখ, ঘট ও সৎ দুইই অভিন্ন পদার্থ, সেইরূপ পট ও সৎ অভিন্ন পদার্থ। এইরূপ আমাদের জ্ঞানের বিষয় যত কিছু বিশেষ বস্তু, তাহারা যে সকলেই সৎ হইতে অভিন্ন, তাহাও আমরা সকলে বুঝি। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, ঘট ও সৎ যেমন একই বস্তু, সেইরূপ, পট ও সৎও ত একই বস্তু। তাহাই যদি হইল, তবে ঘট ও পট এক বস্তু নহে কেন? ঘট ও সৎ হইতে ভিন্ন নহে, পট ও সৎ হইতে ভিন্ন নহে। সৎ বলিলে আমরা একটি পদার্থই বুঝিয়া থাকি। ঘটও সৎ, পটও সৎ, অথচ ঘট পট হইতে ভিন্ন, ইহা কিপ্রকারে সম্ভব? ইহা কি একপ্রকার মায়া নহে? ঘটকে সৎ হইতে ভিন্ন বলিতে পারি না, কারণ, আমি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেছি যে, ঘট-সৎ, অর্থাৎ, ঘট ও সৎ পরস্পর অভিন্ন। অথচ, ঘটকে সৎ হইতে অভিন্নও বলিতে পারি না—কারণ, ঘট যদি সৎ হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে, সৎ হইতে অভিন্ন অন্যান্য বস্তু হইতে সে ভিন্ন হইবে কেন? ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, ক ও খ যদি এক হয়, এবং খ ও গ যদি এক হয়, তাহা হইলে, গ ও ক যে এক বস্তু, তাহা নিঃসন্দেহ ভাবেই সিদ্ধ। যাহাকে সৎ হইতে অভিন্নও বলা যায় না, অথচ যাহা সৎ হইতে ভিন্নও হইতে পারে না, তাহা কি? তাহাই

ত মায়া। এইপ্রকার যুক্তির দ্বারা, জগতের যাবৎ বিশেষ পদার্থ, মায়া বা অনির্বাচ্য হইয়া পড়ে। এইজন্যই মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, এই সংসার মায়া, কারণ, ইহা সৎ, ইহাও বলা যায় না, এবং ইহা যে একেবারে অসৎ, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

আরও দেখ, এই যে সৎপদার্থ, যাহার সহিত না মিলাইয়া এ জগতের কোন বস্তুকেই আমরা বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি না, সেই সৎপদার্থ ও জ্ঞান, কি একই বস্তু নহে? জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক না হইলে, আমরা, কোন বস্তুরই ব্যবহার করিতে পারি না। এইরূপ, সৎ বা সত্তার সহিত সম্পর্ক না হইলেও, আমরা, কোন বস্তুর ব্যবহার করিতে পারি না। সৎও যেমন সামান্য, অর্থাৎ সকলের সহিত মিলিত, জ্ঞানও সেই প্রকার সামান্য—বা সকলের সহিত মিলিত। সত্তের আদি বা অন্ত, আমরা কখনও দেখিতে পাই না, জ্ঞানেরও আদি বা অন্ত আমরা কখনও দেখিতে পাই না।

নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন, ঘটজ্ঞান বা পটজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন জ্ঞানই আমাদের হয়, সেই সকল জ্ঞানই ক্ষণিক, অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় পর, জ্ঞান উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান, একটি ক্ষণমাত্র বাঁচিয়া থাকে, পরক্ষণেই তাহার নাশ হয়। মায়াবাদিগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, জ্ঞান ক্ষণিক হইতেই পারে না, জ্ঞান আদি ও অন্তহীন। সর্বদা সর্বত্র ইহা স্বয়ং প্রকাশ থাকিয়া, সকল বস্তুকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, ইহাই হইল জ্ঞানের স্বভাব। যদি বল, জ্ঞান যে নিত্য তাহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তর এই যে, জ্ঞানের আদি বা অন্ত, তুমি বা আমি, কেহই দেখি নাই, অথচ কোন সময়েই তুমি বা আমি, তোমার বা আমার আত্মার প্রকাশময় ভাবের অভাব দেখিতে পাই না।

মনে কর দেখি তোমার শৈশব—যে শৈশবের ক্রীড়াসামগ্রী, জননীর অঙ্ক, ক্রীড়াসহচর প্রভৃতি বস্তুর একটি না একটিকে লইয়াই তোমার আত্মার অস্তিত্বকে তুমি পূর্ণ বলিয়া বোধ করিতে, যে শৈশবে অনিমিত্ত ক্রন্দন,

অহেতুক হাস্য, অনবরত ক্রীড়াকৌতুকই তোমার আত্মার অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া তুমি বিবেচনা করিতে, সেই শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে, সেই ক্রীড়াসামগ্রীর মোহময় আকর্ষণ, সেই জননীর কোমল অঙ্কের প্রতি ঐকান্তিক তৎপরতা, আর সেই ক্রীড়াসহচরগণের প্রতি স্বর্গীয় অভেদ ভাব, সকলই ত বিস্মৃতির অন্ধকারময় গহ্বরে কোথায় মিশিয়া গিয়াছে! সেই শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে, সেই আবেগময় অনিমিত্ত ক্রন্দন, আর সেই উল্লাসময় অহেতুক হাস্য, কোথায় অতীতের অব্যক্ত ও অসীম ঐক্যময় ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু, তুমি ত এখনও রহিয়াছ। যে অবস্থাগুলিকে তোমার আত্মার নিত্যসহচর বলিয়া ভাবিতে, সেই অবস্থাগুলিকে এখন স্মরণ করিবার শক্তি পর্যন্তও তোমার লুপ্তপ্রায়, অথচ শৈশব হইতে তোমার এই প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত, নিজের আত্মার সত্তা একদিনের জন্য বা এক ক্ষণের জন্য তোমার নিকটে যে অপ্রকাশিত ছিল, বা আছে, ইহা কি তুমি ভাবিয়া উঠিতে পার?

একটা দীপ জ্বলিতেছিল, মধ্যে নিবিয়া গেল, আবার জ্বলিয়া উঠিল; এইরূপ স্থলে যেমন পূর্বের প্রকাশাবস্থা, মধ্যের অন্ধকারাবস্থা, এবং পরে আবার প্রকাশাবস্থা বেশ আমাদের মনের মধ্যে জাগরূক থাকে, সেই প্রকার, শৈশব হইতে এই প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত, তোমার আত্মপ্রকাশরূপ প্রদীপের নির্বাণের পর যে অন্ধকারাবস্থা, তাহা কি তুমি কখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ? সেই শৈশব হইতে এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত, কত অবস্থাকে তুমি আত্মার অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া বুঝিয়াছ, আবার সেই সেই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তুমি নূতন নূতন কত অবস্থাকে নিজের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া চলিয়াছ। কিন্তু, সেই অতীত অবস্থাগুলিকে ভুলিয়াছ বলিয়া, সেই সকল অবস্থার সাক্ষিরূপ তোমার প্রকাশময় আত্মাকে কখনও ভুলিয়াছ কি? দীপ নিবিয়া গেলে যেমন অন্ধকারময় অবস্থা হয়, সেইরূপ তোমার আত্মার অভাবময় অবস্থা, অপ্রকাশময়ভাব, বা ধারাবাহিকতার অভাব, তোমার জীবনে কখনও কি অনুভব করিয়াছ? তাহা ত অনুভব করই নাই,

প্রত্যুত, আমি বলিলে, তোমার মনে সেই সকল অবস্থার সাক্ষী যে এক ধারাবাহিক প্রকাশময় বস্তু প্রতিভাত হয়, মালার মধ্যে সূত্রের ন্যায়, ঘট, পিণ্ড ও চূর্ণের মধ্যে মাটির ন্যায়, অনন্তবিশেষের মধ্যে সর্বানুগত সত্তার ন্যায় যে প্রকাশময় স্বরূপকে তুমি দেখিয়া থাক, তাহাকেই ত তুমি তোমার আত্মা বলিয়া বিবেচনা কর। সেই আত্মা শরীর হইতে পারে না, কারণ, বাল্য হইতে এই বার্দ্ধক্য পর্যন্ত, কত শরীর কমিল, বাড়িল, ভাঙ্গিল, আবার নূতন হইল, সেই আত্মা কিন্তু কমিল না, বাড়িল না, ভাঙ্গিল না, এবং নূতনও হইল না। জ্ঞানই তাহার স্বরূপ। জ্ঞানময়, প্রকাশময় ও সত্তাময় ভাব ছাড়া তাহার অন্য কোন স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না।

তুমি হয়ত বলিবে, আমি যখন স্বপ্ন দেখি বা জাগিয়া থাকি, সেই সময়েই, আমি আমিত্বের উপলব্ধি করি, কিন্তু গভীর নিদ্রাকালে, যখন কোন বিষয়ই প্রকাশ পায় না, যখন সেই সর্ববিস্মৃতির অন্ধকারময় ক্রোড়ে আমি পতিত হই, তখন ত আমার আমিত্বও ভাঙ্গিয়া যায়, বিষয়ের প্রকাশ লোপ পায়, সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মসত্তার স্ফুরণও লোপ পায়। সেই নিদ্রা বা সুষুপ্তিময় অবস্থাতে আমাদের আত্মস্ফুরণ নিবিয়া যায়, সুতরাং আমিত্বেরও বিনাশ হয়, যতক্ষণ জাগরণ বা স্বপ্ন অবস্থা ফিরিয়া না আসে, ততক্ষণ আমাদের জ্ঞান-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়াই থাকে। এই ভাবে জ্ঞানের বা জ্ঞানময় আত্মার বিনাশ ত আমরা প্রতিদিনই অনুভব করিতেছি, আবার জাগরণ বা স্বপ্নাবস্থার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আমিত্ব বা আত্মসত্তার স্ফুরণ জাগিয়া উঠে, সুতরাং, জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলয় প্রত্যহই আমাদের অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। তাহাই যদি ঠিক হইল, তবে কেমন করিয়া মায়াবাদী বলিতে সাহসী হয়েন যে, জ্ঞানের আদি বা অন্ত হয় না? আত্মা এবং জ্ঞান যদি একই পদার্থ হয়, তাহা হইলে আত্মার আদি বা অন্ত হওয়া ত অসম্ভব নহে।

ইহার উত্তর এই যে, সুষুপ্তি বা নিদ্রা যে একেবারেই জ্ঞানহীন অবস্থা, তাহা ঠিক নহে। সুষুপ্তিকালে যে একেবারে আমাদের কোন জ্ঞান থাকে

না, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কেন তাহা বলি। আচ্ছা, সুষুপ্তি অবস্থাকে আমরা জানিতে পারি কি না—ইহার উত্তর কি দিবে বল দেখি? যদি বল, সুষুপ্তি আমাদের জ্ঞাত অবস্থা নহে, তাহা ত কিছুতেই হইতে পারে না; কারণ, যে ব্যক্তি সুষুপ্তি কি বস্তু ইহা জানে না, সে "সুষুপ্তি অবস্থায় কোন জ্ঞান থাকে না" এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া, সুষুপ্তির পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হয় কিরূপে? অর্থাৎ যে সুষুপ্তি কি তাহা জানে না, সে সুষুপ্তির পরিচয় দিবে—ইহা কি প্রকারে সম্ভব? সুতরাং তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তোমার সুষুপ্তি কি, তাহা তুমি নিশ্চয় জান। ফলে দাঁড়াইতেছে যে, তোমার সুষুপ্তি তোমার অজ্ঞাত অবস্থা নহে। আচ্ছা, বল দেখি, সুষুপ্তির জ্ঞান তোমার হইল কি প্রকারে? যখন সুষুপ্তি বর্তমান ছিল, তখন তুমি কি তোমার সুষুপ্তিকে বুঝিয়াছ? অথবা সুষুপ্তি ভাঙিয়া যাইবার পর, তুমি তোমার সুষুপ্তিকে অনুমান করিয়া লইয়াছ? সুষুপ্তি যখন ছিল, তখন যদি তুমি সুষুপ্তিকে বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, সুষুপ্তিকালেও তোমার জ্ঞান ছিল। তাহাই যদি হইল, তবে সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের কোন জ্ঞানই থাকে না—এই প্রকার সিদ্ধান্ত কোথায় রহিল? যদি বল, আমাদের জাগরণের সময় আমরা অনুমান করিয়া লই যে, আমাদের সুষুপ্তিকালে কোন জ্ঞানই ছিল না, কারণ, সুষুপ্তিকালে যদি কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই জাগ্রদ্দশায় তাহার কোন না কোন বিষয়ের স্মরণ হইতেই হইত। এই আপত্তিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ, অনুমান করিতে হইলে, অগ্রে অনুমেয় পদার্থটির স্বরূপ, এবং যে হেতুর দ্বারা অনুমান করিতে হইবে, তাহার সহিত অনুমেয় বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ, এই দুইটি বিষয়ের জ্ঞান পূর্বে থাকাই চাই, না থাকিলে, আমরা কোন বস্তুরই অনুমান করিতে পারি না। এই দেখ না কেন—অগ্নি কি বস্তু তাহা যে জানে না, কিংবা ধূমের সহিত অগ্নির কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহাও জানে না, সে কখনই, দূর হইতে পর্বতশৃঙ্গে ধূম দেখিয়া "এই পর্বতে অগ্নি আছে" এইপ্রকার অনুমান

করিতে পারে না। সেইরূপ আত্মার জ্ঞানহীন অবস্থায় জ্ঞান যাহার পূর্ব্বে কোন প্রকারে হয় নাই, সে "আত্মার জ্ঞানশূন্য অবস্থা এইরূপ ছিল" এই প্রকার অনুমান করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতে পারে না। ইহা সকলেরই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত।

ফলে সিদ্ধ হইতেছে যে, জাগরণ ও স্বপ্ন যেমন আমার অবস্থাবিশেষ, সুষুপ্তিও সেই প্রকার আমার অবস্থা বিশেষ। জাগরণ ও স্বপ্ন যেমন আমার অজ্ঞাত নহে, সেই প্রকার সুষুপ্তিও যখন আসে সে সময় সে আমার অজ্ঞাত থাকে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের যে দ্রষ্টা বা সাক্ষী, সুষুপ্তি অবস্থারও সেই দ্রষ্টা, সেই সাক্ষী।

সুষুপ্তি কি? তাহাই বলি। এই যে মায়াময় বিশ্ব, ইহার দুইটি স্বরূপ আমাদের সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। সেই দুইটি রূপ কি? কার্য্য ও কারণ। সংসার বলিলে আমরা বুঝি কার্য্য ও কারণ। কার্য্য ব্যক্ত—কারণ অব্যক্ত, কার্য্য নানা—কারণ, অব্যক্ত ও একাকার। জাগরণ ও স্বপ্ন কার্য্য, কেন না জাগরণ ও স্বপ্ন ব্যক্তাবস্থা; সুষুপ্তি কারণ, যেহেতু সুষুপ্তি অব্যক্তাবস্থা। এই সুষুপ্তিই সেই মূল অজ্ঞানের আবরণশক্তি; এই আবরণশক্তির প্রভাবে আমাদের প্রকাশময়, আনন্দময় ও সত্তাময় আত্মার স্বরূপ আবৃত হইয়া রহিয়াছে। জাগরণ বা স্বপ্ন আমাদের সেই মূল অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি; এই বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে, জাগরণ ও স্বপ্ন-রূপে ব্যক্ত অজ্ঞান—আমাদের সম্মুখে এই অসীম অথচ অনন্ত প্রপঞ্চকে নির্ম্মাণ করিয়া, আমাদিগকে প্রপঞ্চময় করিয়া তুলিয়াছে। অজ্ঞান প্রথমে বস্তুকে আবরণ করে, পরে বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে সেই আবৃত বস্তুকে ভিন্ন বা কল্পিত আকারে আকারিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, যাহার শুক্তি বিষয়ে অজ্ঞান আছে, তাহার নিকট শুক্তি প্রথমে আবৃত হয়, অর্থাৎ সে বুঝিয়া থাকে "এখানে শুক্তি নাই", "অথবা একণে শুক্তি প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে না"। ইহাই ত অজ্ঞানের আবরণ। আবরণের পরেই, অজ্ঞান আবৃত বস্তুকে অন্য ভাবে

প্রকাশিত করে। শুক্তির স্বরূপ আবৃত হইলে, পরে আমরা সেই শুক্তিকে অন্যভাবে অর্থাৎ "ইহা রজত" এই বলিয়া ব্যবহার করি। সেইরূপ প্রকৃত স্থলে, আমাদের জ্ঞানময় আত্মা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইলে, সুষুপ্ত বা নিদ্রিত হয়, পরে সেই অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তির বিকাশ হইলে, সেই সুষুপ্তিভাবাবৃত আত্মাই জাগরণ বা স্বপ্নরূপ দুইটি অনির্বাচ্য অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হয়। এইরূপ হইলেই, তাহাকে আমরা জাগরিত বা স্বাপ্ন জীব বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি।

এই সকল দেখিয়া কি স্থির হয়? এক চৈতন্যরূপ বস্তুই সৎ, সর্বদা প্রকাশ পাওয়াই তাহার স্বভাব, তাহাই আমাদের সকল প্রকার অবস্থার একমাত্র সাক্ষী। জগতের সকল প্রকার ব্যবহারের তাহাই একমাত্র আলম্বন। তাহাকে আশ্রয় করিয়া কত জাগরণ, কত স্বপ্ন, আর কত সুষুপ্তি—সমুজ্জ্বল সূর্যালোকোদ্ভাসিত অনন্ত অসীম আকাশে মেঘমালার ন্যায় কত শত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, পাইতেছে, এবং প্রকাশ পাইবে, তাহার ইয়ত্তা করিবে কে?

সেই প্রকাশময় আত্মাই এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের একমাত্র অধিষ্ঠান। যাহার স্বরূপ জ্ঞান হইলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তাহাকেই অজ্ঞানের অধিষ্ঠান কহে। তাহারই অজ্ঞান তাহাকেই আবৃত করে এবং তাহাকেই তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহারের গোচর করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই সময় বিশেষে উহা মিশিয়া যায়। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাই আত্মার ক্রিয়া শক্তি এবং আবরণ শক্তি।

সেই অজ্ঞানই মায়া, কারণ, তাহা সৎ কি অসৎ তাহার নিরূপণ করা যায় না। মায়া, সেই প্রকাশময় চিদাত্মা অর্থাৎ জ্ঞান হইতে, ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা এ পর্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই।

কার্য ও কারণের তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য এ পর্যন্ত এ জগতে যত প্রযত্ন হইয়াছে, সে সকল প্রযত্নের একটিও যে সফল হয় নাই, এই দুর্জ্ঞেয় সত্যকে এ জগতে মায়াবাদিগণই প্রথম প্রচার করিয়াছেন। জগতের মূলতত্ত্বের অনু-

সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই যে, এই জগতের মূলতত্ত্ব কি তাহা জানিবার শক্তি মনুষ্যের আয়ত্ত নহে, দর্শনের এই সার সত্যটি যে হৃদয়ংগম করিতে পারিয়াছে, সে-ই অকুণ্ঠিত চিত্তে, সাহসের সহিত, সকলের সমক্ষে বলিতে পারে যে, মানুষের বুঝিবার শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং অত্যন্ত সংকীর্ণ। আমার আমিত্ব যে প্রপঞ্চরূপ মহা-সাগরের একটি বুদ্বুদকল্প, সেই প্রপঞ্চরূপ অনাদি এবং অনন্ত মহাসাগরের অপর পারে কি আছে তাহা আমি জানিতে পারিব, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? এই সর্বপ্রকার অভিমানের দর্পহর পরম সত্যরূপ কুঠারকে আবিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, মায়াবাদিগণ জগতকে অনির্বাচ্য এবং মায়াময় বলিতে সাহস করিয়াছিলেন। মায়াবাদ কোন একটি নূতন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য প্রচারিত হয় নাই, ইহার উদ্দেশ্য স্থাপন নহে, ইহার উদ্দেশ্য খণ্ডন। ইহা বিশদভাবে দেখাইয়া দেয় যে, জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে, এ পর্যন্ত যত প্রকার সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে সেই সকল সিদ্ধান্তই ভ্রমমূলক। কারণ, বিচার করিয়া দেখিলে কোন সিদ্ধান্তই সংগত বলিয়া বোধ হয় না। ইহাই মায়াবাদের গূঢ় রহস্য। গুটিকয়েক উদাহরণ দেখাইয়া আমি এই বিষয়টিকে আরও বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এক্ষণে পরমাণুবাদ বা নব্যনৈয়ায়িকগণের মত সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে জগতে প্রচারিত হইতেছে। আচ্ছা, সেই পরমাণুবাদ কি প্রকার যুক্তিসংগত, অগ্রে তাহাই দেখা যাক্। পরমাণুবাদিগণ বলেন যে, কোন একটি স্থূল কার্যকে যদি ভাগ করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে ভাগ করিতে করিতে আমরা এমন একটি সূক্ষ্মতম ভাগে আসিয়া উপস্থিত হই যে, সেই সূক্ষ্মতম ভাগের আর ভাগ করা সম্ভবপর হয় না। সকল কার্য দ্রব্যকে এই প্রকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া, ভাগ করিতে করিতে, যে সূক্ষ্মতম অবয়বে গিয়া আমাদের আর তাহাকে ভাগ করিবার শক্তি থাকে না, কার্য দ্রব্যের সেই সূক্ষ্মতম ভাগ বা অবয়বকেই পরমাণু বলা যায়। এই পরমাণু নিত্য অর্থাৎ ইহার আর

অংশ নাই। যাহার অংশ আছে বা যে দ্রব্যকে ভাগ করিতে পারা যায়, তাহাই অনিত্য। ভাগ বা অবয়বের পরস্পর মিলনে যে বস্তু নির্মিত হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, কারণ, যে দুইটি অবয়বের মিলনে ঐ বস্তুটি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দুইটি অবয়ব এক সময়ে নিশ্চয় বিভক্ত হইবেই, তাহাদের বিভাগ হইলে ঐ কার্যদ্রব্যেরও বিনাশ হইবেই হইবে, অবয়ব সমূহের মিলন হইল কার্যদ্রব্যের অসমবায়ী কারণ, সেই অসমবায়ী কারণ নষ্ট হইলে যে কার্যদ্রব তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইবে, ইহা আমি আরম্ভবাদ নিরূপণ করিবার সময় বুঝাইয়াছি। ফলে দাঁড়াইতেছে যে, এই স্থূল পরিদৃশ্যমান ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও পবনরূপ প্রপঞ্চ একদিন না একদিন অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জে পর্যবসিত হইবেই হইবে, কারণ, পরমাণুপুঞ্জ-রূপ অবয়বগুলির পরস্পর মিলনে এই স্থূল ও বাহ্য প্রপঞ্চ নির্মিত হইয়াছে। এক্ষণে ভাব দেখি, সেই পরমাণুগুলি যে নিত্য অর্থাৎ তাহাদিগের আর যে অবয়ব নাই, তাহা কেন মানিব? তুমি বলিবে যে, ঐ পরমাণুরূপ সূক্ষ্মতম অবয়বগুলিকে যদি নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার না করিয়া, এইরূপ স্বীকার করা যায় যে, ঐ সূক্ষ্মতম পরমাণুগুলিরও ভিতরে অনন্ত অবয়ব আছে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া, আমরা উহাদিগকে স্থূল দ্রব্যের ন্যায় ভাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড না করিতে পারিলেও, উহাদিগের যে অবয়ব নাই—তাহা নহে, উহাদেরও অবয়ব আছে। আবার সেই অবয়বেরও অবয়ব আছে, তাহারও আবার অবয়ব আছে, আমরা তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া না দেখাইতে পারিলেও, তাহাদের অবয়ব-ধারা যে অনন্ত, ইহা স্বীকার করিতে বাধা কি? এই প্রকার যুক্তি দ্বারা পরমাণুকে ও অনিত্য এবং সাবয়ব দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে, একটা মহান্ অনর্থ আসিয়া পড়ে। সে অনর্থ কি? তাহার উত্তরে পরমাণুবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, যদি পরমাণু সাবয়ব হয়, অর্থাৎ সকল দ্রব্যেরই অবয়বধারার যদি কোথাও বিশ্রাম না হয়, তাহা হইলে, এই জগতে "অমুক দ্রব্যটি বড়, আর অমুক দ্রব্যটি ছোট," এই

প্রকার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ ব্যবহার কিন্তু সর্ববাদিসিদ্ধ। একটি সর্ষপ এবং একটি পর্বত যে পরস্পর অত্যন্ত বিসদৃশ, উহা কে না দেখে? আচ্ছা বল দেখি, একটি সর্ষপের অবয়ব ধারা যদি অনন্ত হয়, অর্থাৎ সর্ষপটিকে যত ভাগ করিয়া কাটিবে, কোন ভাগে গিয়াও তোমার কাটার বিরামের সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহা হইলে, ফলে এই দাঁড়ায় যে, ঐ সর্ষপের অবয়ব অনন্ত। এইরূপ পর্বতের অবয়বধারা যদি অবিশ্রান্ত হয়, তাহা হইলে, তাহারও অবয়ব অনন্ত। ব্যাপারটি মন্দ নহে। একটা ক্ষুদ্র সর্ষপেরও অনন্ত অবয়ব, এবং একটি মহান্ পর্বতেরও অনন্ত অবয়ব, অথচ "সর্ষপটি ছোট, এবং পর্বতটি সুমহান্," এই প্রকার ব্যবহার আমরা কি প্রকারে করিতে পারি? সর্ষপ এবং পর্বতের এই পরিমাণগত বৈষম্য যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে, সর্ষপের উপাদান রূপ পরমাণুর সংখ্যা অল্প, এইজন্য সর্ষপের পরিমাণ ক্ষুদ্র, এবং পর্বতের অবয়বস্বরূপ পরমাণুগুলির সংখ্যা, সর্ষপের অবয়ব সংখ্যা হইতে প্রচুর পরিমাণে বেশী। এই কারণে, অধিক অবয়বের মিলনের ফলে যে পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরিমাণ সর্ষপ হইতে খুব বৃহৎ। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, সকল কার্যদ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে আমরা এমন একটি অংশে গিয়া পড়ি, যে অংশকে আমরা নিত্য এবং নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। না করিলে, এ জগতে "এই দ্রব্যটি ছোট, আর এইটা বড়" এই প্রকার ছোট বড় বিভাগ অসংগত হইয়া পড়ে। এই প্রকার যুক্তির সাহায্যে, পরমাণুবাদিগণ, পৃথিবী, জল, তেজ ও পবনরূপ স্থূলভূত কয়টির উপাদানরূপে অনন্ত নিত্য ও অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং ভোক্তা জীবের ভোগানুকূল অদৃষ্টের প্রভাবে, ঐ পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টির প্রাক্কালে মিলিত হয়। ঐ মিলনের ফলে, ক্রমে স্থূল স্থূলতর ও স্থূলতম প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই হইল, আরম্ভবাদিগণের জগৎসৃষ্টি বিষয়ে মোটামুটি বক্তব্য। এক্ষণে দেখা যাক্, জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে পরমাণুবাদিদিগের উপরিবর্ণিত সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইতে

পারে। মায়াবাদিগণ বলেন, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত বা পরমাণুবাদ, আপাততঃ শুনিলে, সংগত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে বটে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে, এই সিদ্ধান্তের অসারতা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

আচ্ছা বল দেখি, ঐ পরমাণুগুলি যদি একেবারে নিরবয়ব হয়, অর্থাৎ পরমাণুর যদি কোন অংশই না থাকে, তাহা হইলে দুইটি পরমাণু পরস্পরে মিলিত হয় কিরূপে? পরমাণু দুইটি মিলিলে, বা পরস্পর সংযুক্ত হইলে একটি দ্ব্যণুক হয়, আবার তিনটি দ্ব্যণুক মিলিলে একটি ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়, এই ভাবে ছোট ছোট বস্তুগুলি মিলিতে মিলিতে একটা বড় দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, ইহাই ত হইল আরম্ভবাদীদিগের সিদ্ধান্ত। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যাহার কোন অংশ বা অবয়ব নাই, এমন দুইটি বস্তু পরস্পর মিলিত হয় কিপ্রকারে, তাহা তোমরা বুঝাইয়া দেও দেখি। সংযোগের স্বভাবই এই যে, উহা যে দ্রব্যের ধর্ম, সেই দ্রব্যের কোন একটি অংশেই উহার উৎপত্তি হয়। এই দেখ না কেন, আমি যদি পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে, আমার সম্মুখদিক্ হইতে কোন বস্তু আসিয়া যদি আমার সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে, আমার দেহের পূর্বভাগের সহিত, ঐ পূর্বদিক্ হইতে আগত বস্তুর পশ্চিম অংশের সংযোগ হইয়াছে, ইহাই মানিতে হইবে। আমার পৃষ্ঠদেশ বা আমার দেহের পশ্চিমাংশ, এবং আমার সহিত মিলিত সেই দ্রব্যের পৃষ্ঠ বা তাহার পূর্বাংশ, এই দুইটি অংশে পরস্পর সে সময় কোন সংযোগ হইতেছে না, ইহা সকলেই বুঝিয়া থাকে। একটি বস্তুর সহিত আর একটি বস্তুর সংযোগ হইয়াছে, এই কথা শুনিলেই আমরা বুঝি যে, ঐ দুইটি বস্তুর কোন দুইটি অংশ পরস্পর মিলিত হইয়াছে, দুইটি বস্তুর সর্বাংশে সংযোগ কখনই সম্ভবপর নহে, কারণ, সর্বপ্রকারে বা সর্বাংশে দুইটি বস্তুর সংযোগ হইলে, দুইটি বস্তু এক হইয়া পড়ে বিভিন্ন বস্তুর সর্বাংশে সংযোগ যে কি প্রকার—তাহা আমরা ধারণা করিয়াই উঠিতে পারি না। ইহাই যদি সংযোগের স্বভাব হয়, তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, যে-সকল বস্তুর অবয়ব বা অংশ নাই, তাহাদের মধ্যে পরস্পর

সংযোগ হইতে পারে না। তাহাই যদি স্থির হয়, তবে একটি নিরবয়ব পরমাণুর সহিত আর একটি নিরবয়ব পরমাণুর মিলন একেবারে অসম্ভব। পরমাণু নিরবয়ব হইলে, তাহাদের পরস্পর সংযোগ অসম্ভব; আবার যদি পরমাণু সাবয়ব হয়, অর্থাৎ যদি সকল দ্রব্যেরই অবয়ব-ধারা অবিশ্রান্ত বা অনন্ত হয়, তাহা হইলে, জগতে পর্বত এবং সর্ষপের একইপ্রকার পরিমাণের আপত্তি, এই দুইপ্রকার দোষের মধ্যে একটির পরিহার করিতে গেলে, অপর দোষটি যে পরমাণুবাদের উপর আসিয়া পড়িবে, তাহা স্থির। এরূপ স্থলে কি প্রকারে বিবেচক ব্যক্তি পরমাণুদের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারেন যে, পরমাণু সমূহের সাহায্যে আমি জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি? এই কারণেই মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, এই সংসার ও ইহার সৃষ্টি অনির্বাচ্য, সুতরাং ইহা মায়া ছাড়া আর কি হইতে পারে?

এই ত গেল আরম্ভবাদের সৃষ্টিরহস্যের অযৌক্তিকতা। আবার পরিণাম-বাদীর মতে সৃষ্টিবিষয়ে যে সিদ্ধান্ত অবলম্বিত হইয়াছে, তাহারই বা কতটুকু যৌক্তিকতা আছে, তাহাও একবার দেখা যাক্।

পরিণামবাদিগণ বলেন, সৃষ্টির পূর্বে, জগতের মূল কারণ প্রকৃতি এবং পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা, পরস্পর নির্লিপ্তভাবে ও পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকে। এই পরিদৃশ্যমান স্থূল বিশ্ব তখন অব্যক্তভাবে সেই প্রকৃতিতে লীন থাকে, এই-মাত্র। সৃষ্টির পূর্বক্ষণে সমভাবে অবস্থিত সেই ত্রিগুণ প্রকৃতিতে বৈষম্যের অভিব্যক্তি হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণের যে সমতা ছিল, তাহা লুপ্ত হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে, ক্রিয়া-স্বভাব যে রজোগুণ, তাহা প্রবল হইয়া, সত্ত্ব এবং তমোগুণকে অভিভূত করে, এবং স্বীয় কার্য করিবার শক্তিকে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। সেই অভিব্যক্ত রাজসশক্তিই, ক্রমে ক্রমে অব্যক্তভাবে স্থিত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি প্রপঞ্চকে ব্যক্ত করিয়া দেয়। এই ভাবে প্রথম মহত্তত্ত্ব সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার পর অহংতত্ত্ব হইতে ক্রমে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আন্তর এবং তন্মাত্র প্রভৃতি বাহ্যপ্রপঞ্চের অভিব্যক্তি হয়। সেই অভিব্যক্ত

প্রপঞ্চের সহিত অবিবেকপ্রযুক্ত পুরুষ বা চিদাত্মা আপনাকেও প্রপঞ্চের অন্তর্গত বলিয়া বোধ করে এবং প্রপঞ্চের ধর্ম যে সুখ ও দুঃখ, তাহাও আপনার উপর আরোপিত করিয়া তুলে। এই সুখ ও দুঃখের আরোপেই জীবাত্মার সংসারিত্ব। নিষ্প্রপঞ্চ পুরুষের প্রপঞ্চের সহিত সেই অভেদজ্ঞান যখন লুপ্ত হইবে, তখন আর প্রপঞ্চের ধর্ম সুখ বা দুঃখ জীবাত্মাতে আরোপিত হইবে না, এই ভাবে জীবাত্মার সুখ বা দুঃখের ভোগ যেদিন নিবৃত্ত হইবে, সেই দিনই জীবাত্মা আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি বা নির্বাণ লাভ করিবে—ইহাই হইল পরিণামবাদিগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তও যে যুক্তিসহ নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য, মায়াবাদিগণ যে যুক্তির অবতারণা করেন, তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

সৃষ্টির প্রথমে সমভাবে অবস্থিত গুণত্রয়ের মধ্যে একটি গুণ প্রবল হইয়া অন্য দুইটি গুণকে যে অভিভূত করে, তাহার কারণ কি? পরিণামবাদিগণ ইহার কি উত্তর দিবেন? সকল গুণই যখন সমানভাবে অবস্থিতি করে, সে সময়ই ত প্রলয় বা অব্যক্তাবস্থা, সেই অব্যক্তাবস্থায় কোন কার্যই ব্যক্ত ভাবে থাকে না, সুতরাং কোন আগন্তুক কার্য যে গুণবৈষম্য উৎপাদন করিবে, তাহা কি প্রকারে সম্ভব? যদি বল ভবিষ্যৎ প্রাণিগণকে সুখ এবং দুঃখের ভোগ করাইবার জন্য, প্রকৃতি স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইয়া এই বৈষম্যের সৃষ্টি করে, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? কারণ, প্রকৃতি জড়, তাহার চেতনাশক্তি নাই, যাহা জড়, তাহা অপরের সুখ ও দুঃখের ভোগের জন্য স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়—ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? যদি বল, এই প্রকার প্রবৃত্ত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব, তাহাও ঠিক হইতে পারে না, কারণ, প্রবৃত্ত হওয়াই যদি প্রকৃতির স্বভাব হয়, তাহা হইলে, সৃষ্টির ঠিক পূর্বক্ষণে সে প্রবৃত্তি হইল অথচ তাহার পূর্বক্ষণে সে প্রবৃত্তি ছিল না, ইহা কি প্রকারে যুক্তিসংগত হইবে? যাহার যাহা স্বভাব, সে তাহা হইতে কখনই বিচ্যুত হইতে পারে না। যেমন অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, অগ্নি আছে, অথচ তাহার উষ্ণতা নাই,

এমন একটা সময় হইতেই পারে না। সেইরূপ, প্রবৃত্তিই যদি প্রকৃতির স্বভাব হয়, তাহা হইলে, সকল সময়েই তাহাতে প্রবৃত্তি থাকিবেই থাকিবে, এমন কোন সময়ই নাই, যে সময় প্রকৃতিতে সৃষ্টির অনুকূল প্রবৃত্তি নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টির অনুকূল প্রবৃত্তি যদি প্রকৃতির স্বভাব হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি সর্ব্বদাই সৃষ্টি করিতে থাকিবে, তাহার সমভাবে অবস্থিতি কোন কালেই সম্ভব নহে, তাহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থা বা সাম্যাবস্থা এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং, পরিণামবাদিগণের মতে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি সমভাবে বিদ্যমান ছিল, এই প্রকার সিদ্ধান্ত, নিতান্ত নির্যুক্তিক হইয়া পড়িল।

এইপ্রকার যুক্তির দ্বারা মায়াবাদিগণ ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন যে, জগতের আদি সৃষ্টি কি প্রকারে হইয়াছে, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। বাস্তব কথা বলিতে গেলে ইহাও বলিতে হয় যে, এই সংসারের কার্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার করিবার শক্তিও মানুষের নাই।

স্বপ্নাবস্থায় কত কারণ হইতে কত কার্যের উৎপত্তি হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে কার্য ও কারণ দুইটিই অসৎ বলিয়া বিবেচিত হয়, ইহা ত সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। জাগরণাবস্থাতেও আমরা কার্য ও কারণ বলিয়া কত বস্তুকে নির্দ্ধারিত করি, কিন্তু আবার সময়ক্রমে সেই নির্দ্ধারণও আমাদের উল্টাইয়া যায়, ইহাও জীবনে আমরা কতবার অনুভব করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শৈশবে কত বস্তুকে আমরা সুখের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, যৌবনে আবার সেই সকল সুখের কারণকে দুঃখের হেতু বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি, আবার বার্দ্ধক্যে বাল্য ও যৌবনের সুখের ও দুঃখের কারণকে উল্টাভাবে বুঝিবার জন্য আমরা আপনা-আপনিই প্রস্তুত হইতেছি, এই ত হইল সাংসারিক বস্তুর স্বভাব। আবার দেখ, তোমার কাছে যাহা সুখের কারণ আমার কাছে হয় ত তাহা দুঃখের কারণ, অথচ সংস্কারী বিরক্ত

পুরুষের পক্ষে তাহা দুঃখেরও কারণ নহে সুখেরও কারণ নহে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মানুষ কি প্রকারে স্থির করিয়া বলিবে যে, এই বিচিত্র সংসার স্থির ও সৎ? কি করিয়া মানুষ বুঝিবে যে, এই সংসার মায়া বা ইন্দ্রজাল নহে?

কিন্তু এই ইন্দ্রজালময় ও মায়াময় সংসারের মধ্যে একটি বস্তু অর্থাৎ জ্ঞান একভাবে সর্বদাই প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহা জড় বা যাহা জ্ঞেয়, তাহার সত্তা যে একমাত্র জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা আমাদের সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। যাহা কিছু প্রকাশ্য, তাহা হইতে তাহার প্রকাশ যে অত্যন্ত-বিলক্ষণ, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান সংসার যখন জ্ঞেয়, তখন, ইহার জ্ঞান ইহা হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ-স্বভাব, তাহা কে না স্বীকার করিবে?

সেই জ্ঞানই এই সকল প্রপঞ্চের একমাত্র আশ্রয়, কারণ, জ্ঞানকে আশ্রয় না করিলে কোন বিষয়ই ব্যবহারের গোচর হইতে পারে না।

সেই প্রকাশময় জ্ঞানই একমাত্র সৎপদার্থ, কারণ তাহার আদি বা অন্ত কেহই এ পর্যন্ত দেখে নাই, দেখিবেই বা কিরূপে? জ্ঞানের আদি বা অন্ত যদি দৃশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার প্রকাশের জন্য আরও একটি জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং, জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত। জ্ঞান আছে কিনা, তাহা জানিতে আমাদের অন্য কোন প্রমাণ অন্বেষণ করিতে হয় না, কারণ জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ। যাহার দ্বারা জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহাকে প্রকাশ-করিবার জন্য অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় না। সূর্যরশ্মির দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয়, সূর্যরশ্মিকে প্রকাশিত করিবার জন্য সূর্যরশ্মি ছাড়া কি অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা করিতে হয়? কখনই নহে। সূর্যরশ্মির ইহাই স্বভাব যে, তাহা নিজেকে প্রকাশ করিতে করিতেই অপর বস্তুকে প্রকাশিত করিয়া থাকে।

সেই বিশ্ব যাহার দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র।

সেই জ্ঞান পূর্ব্বকথিত অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, এবং আবৃত হইয়া আপনাকেও প্রকাশিত করে, ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের আবরণকেও প্রকাশিত করিয়া থাকে, ইহাই হইল, প্রকাশশীল বস্তুর স্বভাব।

এই দেখ না কেন, মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করে ইহা সকলেই জানে। কিন্তু, যে মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করে, সেই মেঘ কাহার দ্বারা প্রকাশিত হয়? যে সূর্য্যকে ঐ মেঘ আবৃত করে, সেই সূর্য্যের দ্বারাই ঐ মেঘ প্রকাশিত হয়। কেন এমন হয়? সূর্য্য প্রকাশশীল পদার্থ, প্রকাশশীল পদার্থকে যে বস্তু আবরণ করিয়া থাকে, সেই আবরণকেও প্রকাশ করা প্রকাশশীল বস্তুর স্বভাব, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই নিয়মানুসারে মেঘ প্রকাশশীল সূর্য্যকে আবরণ করে বলিয়াই, প্রকাশাত্মা সূর্য্য মেঘকেও প্রকাশিত করিয়া থাকে।

সেইরূপ, এই প্রকাশময় জ্ঞানকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা আবৃত করিয়া থাকে, এবং সেই আত্ম-প্রকাশের সাহায্যে নিজেও প্রকাশিত হয়, ও স্বীয় বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা কল্পিত বস্তুগুলিকেও সেই প্রকাশের সাহায্যেই প্রকাশিত করিয়া থাকে।

এই জ্ঞানই জগতের একমাত্র অবলম্বন, এবং এই জ্ঞানই একমাত্র সদ্ বস্তু। এই জ্ঞানই অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া, নানা এবং পরিচ্ছিন্নভাবে আপনাকেই আপনি প্রকাশিত করিয়া থাকে। এই জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ংগম করিতে পারিলে, আমরা এই জ্ঞানের আবরণ অবিদ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। যেমন, শুক্তির প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞাত হইলে, শুক্তিগোচর অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এবং সেই অজ্ঞান লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই অজ্ঞানের কার্য্য রজতও বিলুপ্ত হইয়া যায়; সেইরূপ, এই জ্ঞান স্বভাব আত্মার প্রকৃতস্বরূপ যদি কেহ অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার আত্মার আবরণস্বরূপ যে অবিদ্যা, তাহাও তাহার আত্মাতেই বিলীন হয়, এবং সেই অবিদ্যাবিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই অবিদ্যা-কল্পিত জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যাধিময় সংসারও বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইল মায়াবাদিগণের নির্ব্বাণ মোক্ষ বা আত্মার কৈবল্য।

দেহ থাকিতে বা দেহের উপর মমতাভিমান থাকিতে এই কৈবল্য হইতে পারে না।

আরও একটি কথা এই যে, ভেদজ্ঞানই আমাদের সকলপ্রকার দুঃখ-ভোগের কারণ, ইহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমি দুঃখ ভোগ করি, সেই সময়, আমার ভেদজ্ঞান থাকিবেই ইহা নিঃসন্দেহ। আমি দুঃখের অনুভব করিতেছি, এই প্রকার জ্ঞানই ত দুঃখভোগ। এই জ্ঞানে তিনটি বস্তু পরস্পর পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই তিনটি বস্তু কি ? জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা। এই তিনটি বস্তুই এই দুঃখভোগ বা দুঃখ জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান, দুঃখের অনুভব, জ্ঞেয় দুঃখ, জ্ঞাতা আমি। দুঃখভোগের ঠিক পূর্বাবস্থায়ও আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহাতেও জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা এই তিনটি বিভিন্ন স্বরূপের বস্তু প্রকাশ পায়। এ জগতের দুঃখের কারণ কি ? ইষ্টবস্তুর বিয়োগজ্ঞান বা অনিষ্টবস্তুর প্রাপ্তিজ্ঞান আমাদের দুঃখ পাইবার কারণ। আমি যখন বুঝি যে, আমার ইষ্ট বিয়োগ হইয়াছে বা হইবে, অথবা আমি যখন বুঝিব আমার যাহা অনিষ্ট তাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, তখনই আমার দুঃখ উপস্থিত হয়। সুতরাং, দুঃখলাভের কারণও যে আমাদের ভেদ-জ্ঞান, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। আমি, আমাব জ্ঞান, এবং আমার ইষ্ট বা অনিষ্ট—এই তিনটি বস্তুর জ্ঞান, সকল প্রকার দুঃখভোগের পূবে থাকিবেই থাকিবে। আবার দেখ, যখন আমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ি, তখন আমাদের এই ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান—এই তিনটি বিভিন্ন বস্তুর প্রকাশ সে সময় একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। সেই গাঢ় নিদ্রার অবস্থায় আমাদের কোন প্রকার দুঃখই অনুভূত হয় না, ইহা সকলেরই বিদিত আছে। আবার সেই সুষুপ্তি ভাঙিয়া যখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নরূপে পরিণত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ভেদজ্ঞানও আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেই ভেদজ্ঞানের অনিবার্য ফলস্বরূপ যে দুঃখভোগ, তাহাও আমাদের হইতে থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভেদজ্ঞান

লুপ্ত হইলে দুঃখও নিবৃত্ত হয়, এবং ভেদজ্ঞান থাকিলেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। তাহাই যদি হইল, তবে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, একেবারে যাবতীয় দুঃখের হস্ত হইতে যিনি পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে, যাহাতে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়, বা ভেদজ্ঞানের উপর যে আমাদের প্রামাণ্য-বুদ্ধি আছে তাহা যাহাতে লুপ্ত হয়, তাহারই উপায় অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সে ভেদজ্ঞান বা ভেদজ্ঞানের উপর প্রামাণ্য-বুদ্ধি কিসে লুপ্ত হয়? অভেদজ্ঞান বা অদ্বৈত ভাবনাই সেই ভেদবুদ্ধি লোপের কারণ। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনটি বস্তুর মধ্যে বাস্তবিক কোনপ্রকার ভেদ নাই, সেই অখণ্ড প্রকাশময় আত্মাই অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, এবং সেই অজ্ঞানেরই বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে, সেই আত্মা জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। শুক্তির আবরক অজ্ঞান যেমন শুক্তিকে রজতরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু শুক্তি বাস্তবিক রজত হইতে পারে না, সেইরূপ, অজ্ঞানও সেই অখণ্ড এক প্রকাশময় আত্মাকে, জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপে বিভক্ত করিয়া ব্যবহারের গোচর করিয়া দিতেছে, বাস্তবিক কিন্তু, সেই প্রকাশাত্মা এক ও অভিন্ন। এইপ্রকার জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে যতই দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইবে, ততই আমাদের ভেদবুদ্ধির উপর অবিশ্বাস জন্মিবে এই ভাবে ভেদবুদ্ধির উপর নির্ভর বা প্রামাণ্য-বুদ্ধি যখন আমাদের একেবারে বিলুপ্ত হইবে, তখন আমাদের আর দুঃখ উৎপন্ন হইবে না। দুঃখের কারণ ভেদজ্ঞান বা ভেদজ্ঞানের উপর প্রামাণ্য-বুদ্ধি—তাহাই যদি বিলুপ্ত হয় তাহা হইলে ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও আমাদের দুঃখভোগ হইবে না। ভেদজ্ঞানের একেবারে লোপ এই দেহ থাকিতে সম্ভবপর না হইলেও, ভেদজ্ঞানের উপর নির্ভর বা প্রামাণ্য বুদ্ধির লোপ করা অসম্ভব নহে। মায়াবাদের পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তিগুলির অনুশীলন ক'রতে ক'রতে আমাদের ভেদজ্ঞানের প্রতি প্রামাণ্য-বোধ বা নির্ভর ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসে। এই ভাবে ক্রমে সেই ভেদজ্ঞানের উপর প্রামাণ্য-বুদ্ধির একেবারে বিলয় হইলে আমরা

এই জীবনেই, সর্বপ্রকার দুঃখ ভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। এই প্রকার অবস্থাকেই মায়াবাদিগণ জীবন্মুক্তের অবস্থা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, দর্শনশাস্ত্র আলোচনার ইহাই ফল। ইচ্ছা করিলে জগতের প্রত্যেক চিন্তাশীল মনুষ্য দর্শনশাস্ত্রের সম্যগনুশীলনের প্রসাদে এই প্রকার জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারেন। অনেক চিন্তাশীল মনীষী এইপ্রকার জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া, সংসারের যাবৎ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন—ইহার প্রমাণ এ পুণ্য ভূমি ভারতে দুর্লভ নহে। ইহা যদি দুর্লভ বা আকাশকুসুমকল্প হইত, তাহা হইলে, এ ভারতে সংন্যাস বা চতুর্থাশ্রম সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইতে পারিত না।

সুখ ও দুঃখ এই দুইটি সর্বানুভব-সিদ্ধ বস্তুই সমগ্র জীব-জগতের প্রবর্তক। ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে প্রকাণ্ডদেহ পর্বতাকার ঐরাবত পর্যন্ত, জীব যাহা কিছু করে, তাহা কিসের জন্য? সুখের আশা এবং দুঃখের পরিহারেচ্ছা, এই দুইটি কারণ ছাড়া জীবনিবহের প্রবর্তনা আর কে করাইতে পারে? কেহই নহে। ইহা কে না বুঝে? আমি কার্য করি, হয় সুখের আশায়, না হয় দুঃখ-নিবারণের ইচ্ছায়। যে কার্য করিলে, আমার সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই, বা যে কার্য করিলে, আমার কোন না কোন একটি দুঃখ মিটিবার সম্ভাবনা নাই, সে কার্য আমি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক কখনই করি না।

এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মানুসারে চলিতে চলিতে মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা দ্বারা সকল সময়ই যে মানুষের চরিতার্থতা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, এ জগতে কত লোক কতপ্রকারে সুখী হইবার জন্য কত কি না করিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া, সকলেই কি নিজের ইচ্ছানুসারে সুখলাভে সমর্থ হইয়াছে? কত লোক কত ভাবে বর্তমান বা অনাগত দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য কত অসাধ্য কার্য করিতেছে। তুমি কি বলিতে পার তাহারা সকলেই সে কার্যের ফলে তাহাদের সেই ভীষণ দুঃখের করাল

গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে ? কখনই না—মানুষ আশার ছলনায় কার্য করে এই মাত্র—কিন্তু আশাকে পরিপূর্ণ করিবার শক্তি মানুষের হস্তগত নহে, কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। মানুষের ভাবনাশক্তি নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন, আবার সেই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানও যে সকল সময়ে যথার্থ, তাহা নহে। অনেক সময়ে, মানুষ যে বস্তুটিকে যে ভাবে ভাবিয়া থাকে, সে বস্তুটি যে ঠিক সে ভাবের নহে—ইহা কে না জানে ? মানুষ সময়ে সময়ে একগাছা দড়িকে সাপ ভাবিয়া ভয়ে পলাইতে গিয়া হাত পা ভাঙিয়া বসে, সে মরুমরীচিকায় জলের ভ্রান্তিতে ঘুরিতে ঘুরিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও সময়ে সময়ে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। এই মানুষের জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা ও অযথার্থতাকে দূর করিয়া অপরিচ্ছিন্ন ও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করিবার উপায়েরই নাম মায়াবাদ।

উপসংহার

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই এই মায়াবাদের উৎপত্তিক্ষেত্র। বাবিলন, আসীরিয়া, ইজিপ্ট, গ্রীস ও রোমে যখন সভ্যতাসূর্য সম্যক্ উদিত হয় নাই, তাহারও অনেক পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ গাহিয়া গিয়াছেন—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।"

যে জানিয়াছে—জগতের মূলতত্ত্ব জ্ঞেয় নহে, সেই বুঝিয়াছে। আর—যে ভাবে—জগতের মূলতত্ত্ব জ্ঞেয়, সে বুঝিতে পারে না।

এক কথায় বলিতে গেলে—এই স্বকীয় অজ্ঞতার জ্ঞানই মানবীয় জ্ঞানের চরম সীমা। এই অজ্ঞতার জ্ঞানই দার্শনিক সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি। ইহারই স্থাপনের জন্য বহু সহস্রবর্ষ পূর্বে ভারতীয় দার্শনিক ঋষিগণ যে প্রমাণতত্ত্ব এই ভারতে প্রচার করিয়াছেন, জগতের যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র তাহারই ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে অনেক স্থলেই সে ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ অথবা বিকৃত, আবার কোথাও বা ঐ ব্যাখ্যা অনেকাংশে মূলানুগত, এইমাত্র প্রভেদ।

এই মায়াবাদই ভারতীয় বিদ্যারত্নরাজির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল। এই সমুজ্জ্বল রত্নের সুশীতল জ্যোতিতে আত্মার অন্ধকার দূর করিয়া শান্তিলাভ করিতে হইলে ইহার নিকটবর্তী হইতে হয়। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে না পারিলে ইহার নিকটবর্তী হওয়া অসম্ভব। নানা কারণে সকলের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ বর্তমান সময়ে সম্ভব নহে। অথচ বঙ্গভাষা উন্নতির মুখে অগ্রসর হইলেও ইহা দার্শনিক ভাষার মধ্যে এখনও পরিগণিত হইতে পারে নাই। এই কারণে, মাতৃভাষার সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার গৌরব এই মায়াবাদের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিবার বা বুঝাইবার জন্য অনেকের আন্তরিক আগ্রহ থাকিলেও, কোন বিশেষ ফললাভ হইতেছে না। আমাদের মাতৃভাষায় ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষাগুলির প্রচার দেশে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে হয়, তাহার জন্য, যে সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এ পর্যন্ত অনুবিস্তর প্রযত্ন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিলাম। আশা করি, সহৃদয় পাঠক আমার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এ বিষয়ে যে-সকল ত্রুটি ঘটিয়াছে, তাহা মার্জনা করিতে বিমুখ হইবেন না।